দুই রমণীর গপ্পো

অমিত রায়

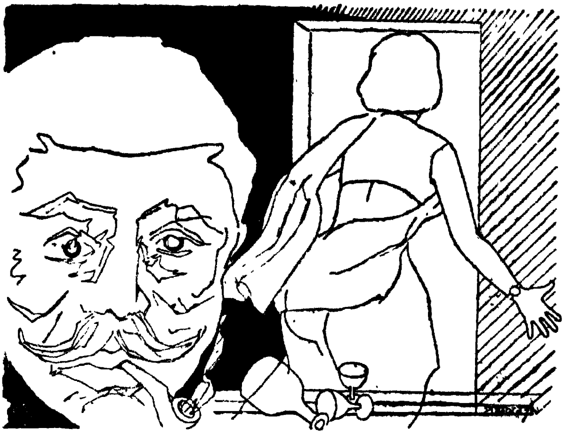
শৈব্যা পুস্তকালয়
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রকাশক ঃ
রবীন বল
৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
অমিয় ভট্টাচার্য

প্রথম প্রকাশ ঃ
শ্রীপঞ্চমী, মাঘ ১৩৭১

মুদ্রক ঃ
ফিনিক্স প্রিন্টার্স
২, চোরবাগান লেন,
কলকাতা ৭০০০০৭



একালের গল্প

উৎসর্গ ঃ

আমার সাহিত্য জীবনের দীক্ষাগুরু পিতৃপ্রতিম
সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসুকে—

প্রসঙ্গত

মাষ্টারমশাই সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসুর ধমক খেয়ে কলম ধরেছি বাংলা সাহিত্য জগতে আমার এই আকস্মিক অনুপ্রবেশ নিন্দিত বা প্রশংসিত কি হবে তার সঠিক কোন ধারণা না নিয়েই। মনে মনে অবশ্য ছেলেবেলা থেকে শোনা সেই বহুল প্রচারিত প্রবাদটা সর্বদাই ভাবছি—আরশোলার আবার পাখী হয়ে উড়বার সাধ।

সাপ্তাহিক 'সাতদিন'-এর বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত এই উপন্যাস দু'টি কোন দিনই হয়ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হতো না যদি না এর পশ্চাতে বন্ধুবর কল্যাণ বসুর উৎসাহ এবং সার্বিক সহযোগিতা থাকতো। সেই সঙ্গে সমানভাবে সাহায্য করেছেন অগ্রজ প্রতিম শ্রী পি, কে, গুহ, বন্ধুবর প্রদীপ সেন, নীহার ভট্টাচার্য, রবীন বল, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল বসু এবং হারাধন বসাক। এই ব্যাপারে আর যে সব বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী আমাকে সাহস জুগিয়েছেন তাদের সকলের কাছেই আমি বিশেষভাবে ঋণী।

উপন্যাস দু'টি পাঠক সমাজে প্রশংসিত হলে প্রশংসার ভাগ পুরোটাই সহযোগীদের প্রাপ্য। নিন্দাকে আমার অক্ষমতার যোগ্য প্রাপ্তি বলেই ধরে নেবো।

অমিত রায়

(১)

কলকাতার অভিজাত এলাকার বিউটি পারলার থেকে হেয়ার ড্রু এবং ফেসিয়াল ওয়াক্সিং সেরে তপতী মুখার্জি একটা টুটি ফ্রুটি খাবার জন্য ম্যাগসে গিয়ে ঢুকলো। কদিন যাবৎ কলকাতায় গরম পড়েছে বেশ। লোড শেডিং-এর কল্যাণে বাড়ির এয়ার কণ্ডিশনার ঠিকমত চলতে পারে না। গরমটা অসহ্য বলে মনে হয় আজকাল তপতীর।

আজ সন্ধ্যায় মিঃ রাঘবনের বাড়ি ককটেল পার্টি। তারই জন্যে মিসেস তপতী মুখার্জির এত সাজগোজের মহড়া। তপতীর বয়স তিরিশ ছুঁই ছুঁই করছে। চার বছর হল বিয়ে হয়েছে। স্বামী অলক মুখার্জি পাঁচ বছরের আগে সন্তানের পিতা হতে চান না। তাই মনে মনে ইচ্ছে থাকলেও স্বামীর ইচ্ছেটাকেই মেনে নিয়েছে তপতী।

তপতী মুখার্জির ছাত্রীজীবন কেটেছে বাঙলাদেশের এক অখ্যাত শহরে। শহরের একমাত্র মহিলা কলেজ নিস্তারিনী মহাবিদ্যালয় থেকে তপতী বি. এ. পাশ করেছে বিয়ের বছরেই। গোঁড়া পরিবারের মেয়ে। মাসে একটা সিনেমা দেখতে হলে অনেক সাধ্য সাধনার পর বাবার মত পাওয়া যেত। প্রসাধন বলতে গরমকালে আফগান পাউডারের বড় কৌটো এবং শীতকালে বড় জোর বোরোলীনের টিউব ছাড়া অন্য কিছু হাল ফ্যাসানের জিনিস বাড়ীর ত্রিসীমানায় ঢুকতে পারত না। অথচ তপতীর বাবা রামময় বাবু গরীব ছিলেন না, অর্থের মাপকাঠিতে তাঁকে বরং বিত্তশালীই বলা চলে। তবে রুচিটা তাঁর ছিল ভীষণ সেকেলে। আধুনিকতা পছন্দ করতেন না একেবারেই।

তপতীর শরীরে যখন যৌবন এল তখন বাঙলাদেশে বডিজের প্রচলন উঠে গেছে। সারা দেশে নারী প্রগতির জয়ধ্বনি। আধুনিক সিনেমার কল্যাণে দূর মফঃস্বলের অনেক মেয়েই বিয়ের আগে দু একটা প্রেম প্রেম

খেলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। রামময় বাবু বুঝতে না চাইলেও তপতীর মা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এ পরিবর্তনের ধারা। তাই একটু মডার্ন করবার জন্ত তিনি মেয়েকে ব্রা কিনে দিতেন—হাল ফ্যাশানের লো কাট ব্লাউজও দু' একটা করিয়ে দিয়েছিলেন।

অনেক স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে পশ্চিম বাঙলার এক অখ্যাত শহরে তপতীকে জীবনের পঁচিশটা বসন্ত কোনমতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কাটাতে হয়েছে। কলেজ বাসে যাতায়াত, মাঝে মধ্যে কলেজের মেয়েদের সঙ্গে দু একটা সিনেমা দেখা ছাড়া অপ্রয়োজনে বাইরে বেরুনো বারণ ছিল তপতীর। আর বাবার ভয়ে ভালবাসাবাসির কথাতো চিন্তাই করতে পারত না। তবু বসন্তের পলাশ শিমুল আর কৃষ্ণ-চূড়ার লাল রং যখন আকাশ বাতাসে হোলি খেলা স্নুরু করত তখন তপতীর মনও বসন্তের মাতাল দাপাদাপি প্রত্যক্ষ না করে পারে নি। মনের ইচ্ছেটাকে যে খাঁচায় বন্দী করে রাখতে পারা যায় না।

এত কড়াকড়ির মাঝেও তাই তপতী পূব পাড়ার অরুণের চোখে নিজের সর্বনাশ দেখতে পেয়েছিল। কলেজ বাসটা যখন নিস্তারিণী কলেজের দিকে ধুলো উড়িয়ে চলে যেত—তখন রাস্তার ধারের পানের দোকানের সামনে নির্দিষ্ট সময়ে অরুণ কুমার সাইকেলটা হাতে ধরে অপেক্ষা করত তপতীকে একটু দেখবার জন্যে।

তপতীর কোমল হৃদয়ে বর্ষার উন্মত্ত দাপাদাপি স্নুরু হয়ে যেত। শরীরের সব রক্ত মুখে এসে জমা হোত। গলা শুকিয়ে আসত ভয়ে-আনন্দে। বন্ধুরা বলত আদিখ্যেতা। হয়ত তাই। কিন্তু তপতীর পারিবারিক পরিবেশে—তপতীর মানসিকতায় ভালবাসা ছিল ভীষণ একটা নিষিদ্ধ ব্যাপার। অনেক চেষ্টায় বাবার রক্ত-চক্ষুর কথা স্মরণ করে তপতী মনকে শাসন করতে চাইতো বারবার। কিন্তু পোড়া মনের প্রাণ-পাখীটা খাঁচার বাঁধন ছিন্ন করে খোলা আকাশের নিচে মুক্তির গান গেয়ে উঠতে চাইতো বার বার। এমনি করেই ভয় আর আশঙ্কার পাঁচিল ডিঙিয়ে তপতীর জীবনে প্রেমের প্রথম পদসঞ্চার ঘটলো।

নিত্য-নৈমিত্তিক দেখাশোনার খেলায় মনের গভীরের অন্তর্লোকে দৃষ্টিক্ষেপণ করে তপতী বুঝতে পেরেছিল যে অরুণ নামক যুবকটিকে সে ধীরে ধীরে, পলে

পলে নিজের সমস্ত চেতনা আর অনুভূতি দিয়ে ভালবেসে ফেলেছে। কিন্তু গতিবিধির নিয়ম কানুনের ফাঁসে সাক্ষাৎ বাক্যালাপ খুব একটা বেশি সম্ভব হয়নি। বিয়ে, বৌভাত, অন্নপ্রাশন, ইত্যাদি মাঝে মধ্যের দু একটা সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে চুরি করে দুএক মুহূর্তে যা কথাবার্তা। তবে আগ্রহের অভাব ছিল না কোন পক্ষেরই। এই ভাবেই মনের গোপনে উভয়ের মনেই ভালবাসার বীজ ক্রমশঃই শাখা প্রশাখা বিস্তার করে বিশাল বটবৃক্ষে রূপান্তরিত হচ্ছিল দিনে দিনে।

দীর্ঘ এক বছর বাদে তপতী বান্ধবী গীতার বিয়ের নিমন্ত্রণ সেরে জীবনে প্রথম একাকী সাইকেল রিক্সা করে বাড়ি ফিরছিল। পিতা রামময় বাবু কি একটা জরুরী কাজে শহরের বাইরে থাকাতে তপতীকে নিয়ে আসার জন্যে হাজির থাকতে পারেন নি। ছোট ছেলেকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, কিন্তু তপতীই তাকে বারণ করেছিল যাবার জন্য। বিয়ে বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় একটু যেতেই দেখল, অরুণ উল্টো দিক থেকে একেবারে সামনা-সামনি এসে হাজির। নেহাতই ঘটনাচক্র। তপতীকে একলা দেখে অরুণ একটু আশ্চর্য হয়ে বলল—কি ব্যাপার তপতী। তুমি একা একা রাস্তায় চলেছ। সত্যি না স্বপ্ন দেখছি!

অরুণের প্রশ্নের ভঙ্গীতে তপতীর গলা কেঁপে গেল। অদ্ভুত একটা খুশি আর ভয় তপতীকে বিহ্বল করে দিল। তপতী জবাব দিতে পারল না।

—কি হল মুখে কথা নেই কেন। আরে বাবা, আমি ভূতও নই আর বাঘও নই যে তোমায় খেয়ে ফেলবো। নামো—নামে—আর রিক্সোতে গিয়ে কাজ নেই—আমি তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি।

যন্ত্রচালিতের মত তপতী রিক্সা থেকে নামলো। বাবা বাড়ি নেই—মা জানলেও বেশি কিছু বলবেন না। তপতী জানে। তবু জীবনে এই প্রথম নির্জনে প্রিয়তমের মুখোমুখি হয়ে তপতী ভাষা হারিয়ে ফেলল। রিক্সা থেকে নেমে নীরবে অরুণের পাশাপাশি হাঁটতে লাগল তপতী। পাশেই একটা খেলার মাঠ। অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকার। রাত্রি প্রায় নটা। শহরের এদিকটা লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। মাঠটা পেরিয়ে একটু গেলেই তপতীদের পাড়া শুরু।

অরুণ একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরে ধীরে বলল—জীবনে এই প্রথম একলা পেলাম তোমাকে। অথচ তুমি কোন কথা বলছ না তপতী। কত কথা মনে এসে ভীড় করছে কি বলব—কি দিয়ে শুরু করব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তোমার পিউরিটান হোলি ফাদারের ওপর খুব রাগ হয়। ভদ্রলোকের মন বলে বোধ হয় কোন পদার্থ নেই।

—গুরুজনদের নিন্দে করতে নেই—খুব ধীরে ধীরে স্বপ্নোত্থিতের মত তপতী অস্ফুট স্বরে জবাব দিল।

উল্লাসে চীৎকার করে ওঠে অরুণ - হুররে—এই তো ময়নার বুলি ফুটেছে। আমি ভাবলাম তপতী দেবী বোধ হয় ভয়ে ভাবনায় মূর্ছা গিয়েছেন। একটু গম্ভীর হয়ে অরুণ বলল, মুখে বার বার না বললেও তুমি জান তপু তোমাকে আমি ভালবাসি। রোজ তোমাকে শুধু একটু দেখবো বলে সব কাজ ফেলে দাঁড়িয়ে থাকি রাস্তায়। আজকের দিন অন্তত তুমি চুপ করে থেকো না। কথা বল তপতী। প্লিজ—কিছু তো বল। আবেগে তপতীর কম্পমান হাত দুটোকে শক্ত করে ধরে থাকে অরুণ।

—হাত ছাড়ুন। কেউ দেখে ফেলবে।

—দেখুক আমি ভয় করি না। সারা পৃথিবীকে শুনিয়ে শুনিয়ে আজ আমার বলতে ইচ্ছে করছে—তোমরা শোন—দু কান খুলে শোন—তপতী নামের এই মিষ্টি মেয়েকে আমি ভালবেসেছি। তপতী আমার—একান্ত-ভাবেই আমার।

—ছিঃ! পাগলামী করবেন না। চেঁচাচ্ছেন কেন—তপতী কাতর-কণ্ঠে বলে ওঠে।

—ঠিক আছে চেঁচাব না। কিন্তু আজ আমাকে একটু সময় দাও তুমি। এস মাঠের ধারের ঐ বেঞ্চিতে কিছুক্ষণ বসে বসে গল্প করি। না কোরোনা তপতী। তোমার চোখের তারায় আজ প্রাণভরে বিদ্যুতের ঝিলিক দেখতে দাও। আমার কি ইচ্ছে করছে জান। সারারাত বসে শুধু তোমায় চেয়ে চেয়ে দেখি—প্রাণভরে দেখি।

তপতীর প্রাণে উথাল পাতাল সাগরের তোলপাড়। তবু তপতী মেয়ে। একটু বেশি সাবধানী। তাই কথা না বলে ধীরে ধীরে মাঠের বেঞ্চটার ওপর গিয়ে বসে। ভয়ে, সঙ্কোচে তপতী চলে যেতে চাইছিল। কিন্তু অরুণের আকুল আহবান একটা অদ্ভুত আনন্দে অবশ করে সারা শরীরে তার বিদ্যুত সঞ্চার করে দিচ্ছিল। কোনমতে সহজ হয়ে তপতী বলল—আপনি তো আমার পরিবারকে জানেন। এ সম্ভব নয়। আপনি আমায় ভুলে যান—এতে আমার আপনার দুজনেরই মঙ্গল।

—মঙ্গল, অমঙ্গল জানি না। তোমায় না পেলে আমি বাঁচবো না তপু। আমি মরে যাবো।

—পাগলামি করবেন না। বিয়ে থা করুন। দেখবেন আমার কথা আর মনে পড়বে না আপনার। সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনার ভালবাসা আমি ভুলতে পারব না কোনদিন। মনের মণিকোঠায় চিরদিনের জন্যে ধরে রাখবো। কিন্তু যা সম্ভব নয়—তা চাইতে গেলে আমাদের ভাল হবে না। অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে—আমি বাড়ি যাই।

তপতী উঠতেই আচমকা একটা হ্যাঁচকা টান দিল অরুণ। টান সামলাতে না পেরে তপতী অরুণের কোলের ওপর এসে পড়ল। আর অরুণ দু'হাতে তপতীকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত ঠোঁটে মুখে বুকে—তপতীর সারা শরীরে চুমু খেতে লাগলো।

তপতী বাধা দিতে পারল না। সুখানুভূতির শিহরণে তপতীর চোখ দুটো বুঁজে এল। সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগলো। কিছুক্ষণ বাদে সম্বিত ফিরে আসতেই তপতী জোর করে অরুণের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে অবিন্যস্ত শাড়ী চুল ঠিক করতে করতে বলল—এ আপনি কি করলেন। কেউ দেখে থাকলে আমার কি হবে বলুন তো। রাস্তার মাঝে এ রকম পাগলামী করে কেউ।

ভয় পেলেও ভাল লেগেছিল তপতীর অরুণের এ পাগলামী। সমস্ত নারীই মনে মনে তার ভালবাসায় মানুষের শক্ত বাহুর বন্ধনে নিষ্পিষ্ট হতে ভালবাসে।

চেতনায় ফিরে এসে তপতী বলল—আপনি বাড়ি যান। একসঙ্গে আমাদের দেখলে আমার খুব ক্ষতি হবে। এটুকু রাস্তা আমি ঠিক চলে যাব।

সেদিন বাড়ি এসে সারা রাত তপতী ঘুমোতে পারেনি। একটা অচেনা নতুন অনুভূতি সারা রাত ধরে তার মনকে তোলপাড় করে দিচ্ছিল বার বার।

বাড়ি ঢুকতেই মা জিজ্ঞেস করেছিলেন—তপু তোকে কি রকম কি রকম লাগছে। হ্যাঁরে—শরীর খারাপ হয়নি তো!

—না—মা। খুব গরম পড়েছে তো। বিয়ে বাড়ির ভিড়ে ভাল লাগছিল না। তপতী জবাব দিয়েছিল।

ঐ ঘটনার পর অরুণের সঙ্গে বিয়ের আগে আর একাকী সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেনি তপতীর। কিন্তু মনের বাসনাটার মৃত্যু ঘটেনি তার। বাবার প্রতি একটা চাপা বিক্ষোভ তপতীকে চঞ্চল করে তুলতো। বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে করত এক এক সময়। তপতী জানতো বাবা মা কেউই এ বিয়েতে মত দেবেন না। তাই কেলেঙ্কারী এড়াবার জন্য নীরবে তপতী সবকিছু মেনে নিয়েছিল বটে কিন্তু অরুণের প্রতি তার ভালবাসাটা গভীর ভাবে মনের ভেতর গেঁথে গিয়েছিল।

সাধারণ বাঙালী ঘরের মেয়ে বলেই হয়ত বাবা যখন তার বিয়ের ব্যবস্থার তোড়জোড় সুরু করলেন তখন তপতীর তা না মেনে উপায় ছিল না। মনের ভেতর অরুণ নামক যুবকের ব্যর্থ ভালবাসার জ্বালাটুকু জেনেই তপতীকে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসতে হল।

(২)

তপতীর স্বামী অলক মুখার্জি সুদর্শন এবং নামকরা এক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনাপূর্ণ মাঝারি পর্যায়ের অফিসার। উত্তরবঙ্গে বাবার জমি জায়গা প্রচুর। সুতরাং বিয়ের পর তপতীকে কিছুদিন উত্তরবঙ্গে কাটিয়ে কলকাতায় নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে নিজের সংসারের রাজেন্দ্রাণী হতে হয়েছিল।

অলক মুখার্জি যখন প্রথম কলকাতা এসে চাকরীতে এসে ঢুকলো তখন বেশ বুঝতে পারল যে তার পয়সা থাকলেও আভিজাত্য নেই। তাদের অফিসের ইঙ্গ বঙ্গ সোসাইটির এ্যাফ্লুয়েন্সিতে মনে মনে একটা হীনমন্যতা বোধ করতো সে। কলকাতা এসে অলক মুখার্জি অনুভব করলো যে উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জ শহর থেকে সারা পৃথিবীটা অনেকখানি এগিয়ে গেছে—এবং এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে না যেতে পারলে তাকে এখন যে সমাজে ঘোরা ফেরা করতে হচ্ছে সেখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। আর এই প্রতিষ্ঠালাভের বাসনায় চাকরীতে ঢোকার পর অলক মুখার্জি আস্তে আস্তে নিজেকে তৈরী করতে লাগলো।

অলকের একমাত্র বোনের বিয়ে হয়েছিল পাড়াগাঁয়ে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ার পর। মা ছিলেন একেবারে সেকেলে। কলকাতা এসে নতুন সমাজের মেয়েদের নানা পার্টি, ক্লাবে দেখতে দেখতে অলক নিজের স্ত্রী সম্পর্কে একটা বিশেষ প্যাটার্ণ ছকে নিয়েছিল। সমাজে জাতে ওঠার তাগিদে অলক যেচে যেচে বড়লোক বন্ধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে সুরু করল। তাই মফঃস্বল শহরের মেয়ে তপতীর সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে প্রথমে তার খুব একটা আগ্রহ দেখা যায় নি। তবু বাবার কথা অমান্য করবার সাহস হয়নি তার। মনে মনে ভেবেছিল বি, এ যখন পাশ করেছে তখন নিজের মনের মতন গড়ে পিটে মানুষ করে তুলবে স্ত্রীকে।

বিয়ের পরে তাই কলকাতায় এসে অলক তপতীকে গড়ে তোলবার পরিকল্পনায় কোমর বেঁধে লাগল। তপতী অসামান্যা সুন্দরী না হলেও রূপবতী। একটা মিষ্টি চটক আছে চেহারায়। যৌবন উজাড় করে গড়ে তুলেছে তপতীর দেহ-সম্পদ। তার ওপর একটা গ্রাম্য সরলতা তার মুখে চোখে একটা আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। একবার চোখে পড়লে দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে পারা যায় না।

অলকের উচাকাঙ্খার সঙ্গে তাল মেলাতে তপতী প্রথম প্রথম হাঁফিয়ে উঠতো। অলককে বলত—কি হবে এসব ছাই ভস্ম। সেই তো ঘর সংসার করতে হবে—এত মডার্ন হয়ে লাভ কি। তোমার মন পেয়েছি—আমার আর কিছু চাই না।

অলক তপতীকে বোঝাতো—বুঝলে তপু। জীবনে বড় হবার স্বপ্ন দেখছি অনেকদিন ধরে। আজ নিজের চেষ্টায় বড় চাকরী পেয়েছি। গাড়ী, কোম্পানীর সুদৃশ্য ফ্ল্যাট, ফ্রিজ সবইতো একে একে করতে পেরেছি। আমার পুরোনো অতীতটাকে ঝেড়ে ফেলে আমি সোসাইটির পাঁচ জনের একজন হতে চাই—ইউ মাষ্ট হেল্প মি তপু! আমি সহজে থামতে চাই না। অনেক—অনেক বড় হতে চাই আমি।

—তুমি বড় হও—আমিও তো তাই চাই—কিন্তু আমায় নিয়ে টানাটানি কেন! আমায় ঘরে থাকতে দাও না। আমি ঘরের বউ—বাজারে পাঁচ জনের হাটে আব্রু খসাতে আমার মন চায় না। আমার কি রকম ভয় হয় মনে।

কিন্তু অলক বুঝতে চায় না। অলক সেই ধরনের মানুষ—যারা যে কোন মূল্যে জীবনে সাফল্য অর্জনে বিশ্বাসী। তপতীর মর্ডান হবার যজ্ঞে ইংরেজ মহিলা রেখে প্রথমেই তপতীকে ইংরাজী বলা আর আদব কায়দা রপ্ত করতে হল। সোসাইটিতে জাতে উঠবার দৌড়ে বিয়ের এক বছরের মধ্যেই তপতীর শাড়ী নিচে নামতে নামতে নাভীর ডেঞ্জার জোন পেরিয়ে যেতে দেরী লাগল না। ব্লাউজের কাপড় বাহুল্যবোধে হ্রস্বতা পেতে পেতে চোলিকে লজ্জা দিতে লাগলো। চুল ববড্ হল—নিয়মিত ফরেন কসমেটিকের প্রলেপে—ম্যাসকারা, আই ব্রো আর ফেস গ্লীমারের কল্যাণে—তপতীর গ্লামার বাড়তে লাগলো দিনে দিনে।

আধুনিকতার রেসে প্রাথমিক সঙ্কোচ কাটিয়ে পার্টি হোটেল, অফিস ও সোসাইটির মহিলাদের আচরণ—আর হাবভাব দেখতে দেখতে তপতীর মনের পুরোনো সংস্কারটা বন্যার স্রোতের মত ভেসে গেল। অতীতের মরা ফসিলের ভেতর থেকে জন্ম নিল নতুন তপতীর—মিসেস তপতী মুখার্জির।

মেয়েদের স্বভাবটাই হচ্ছে জলের মত। পাত্রভেদে আকৃতি গড়ে ওঠে। নানান অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে দেরী লাগে না সাধারণত মেয়েদের।

আজ এ পার্টি কাল সে পার্টিতে—তপতীর মোহনীয় সঙ্গ অলকের অফিসের

সহকর্মী এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের কামনার বস্তু হয়ে দাঁড়াতে লাগলো। নিজেদের সোসাইটিতে তপতী ধীরে ধীরে মক্ষিরাণী হয়ে উঠলো অন্য সকলকে টেক্কা দিয়ে। তপতীর মনে হতে লাগলো সার্থক জীবন বলতে কোন রমণীর জীবনে এর চাইতে কাম্য আর কি থাকতে পারে।

তপতীর এই রূপান্তরে মনে মনে খুশী হল অলক। তপতীকে নিয়ে তার মনে মনে একটা গর্ব দেখা দিতে লাগলো। তপতীর জন্যেই অলক আজকাল অফিসের উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষের নেক নজরে পড়তে লাগলো।

—জান তপু। মিঃ মালহোত্র সেদিন বলছিলেন, মুখার্জি আই মাস্ট সে দ্যাট ইউ আর দি মোস্ট লাকিয়েস্ট ডগ আই হ্যাভ এভার সিন। ইওর ওয়াইফ ইজ এন এ্যাঞ্জেল। বাঙালী মেয়েরা যে এত স্মার্ট হতে পারে মিসেস মুখার্জিকে না দেখলে বুঝতেই পারতাম না—রাতে শুয়ে শুয়ে অলক তপতীকে বলল।

—তপতী একটু আদো আদো স্বরে জবাব দেয়—ও। তোমাদের ঐ হোৎকা ম্যানেজিং ডিরেকটার মালহোত্র। লোকটাকে আমি একদম স্ট্যাণ্ড করতে পারি না। একদম আনকালচারড আর অসভ্য। পার্টিতে ছুতোয় নাতায় খালি গায়ে হাত দিতে চায়।

—ওঃ তপু! তুমি এখনও সেকেলে রয়ে গেলে। পার্টিতে ড্রিঙ্ক করে অমন একটু আধটু সবাই করে থাকে। প্লিজ তুমি আবার উল্টা পাল্টা কিছু বলে ওকে আবার চটিয়ে দিও না যেন। আমার প্রমোশনের মালিকই হচ্ছে মালহোত্র।

তপতীকে বুকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে অলক বলে চার বছর হয়ে গেল আমাদের বিয়ে হয়েছে। তোমাকে দেখলে আমারই মাথা খারাপ হয়ে যায় তা মালহোত্র। জান তপু! অফিসে আমাদের বস এবং সহকর্মীদের মধ্যে তোমার কি ডিমাণ্ড, কি পপুলারিটি। তুমি ছাড়া আজকাল কোন পার্টি জমে না। সকলের মুখেই এক কথা—মিসেস মুখার্জি—মিসেস মুখার্জি। তোমার জন্যে আমার যে কি গর্ব হয় কি বলব।

—দেখো আবার গর্ব শেষে ঈর্ষায় না দাঁড়ায়। তপতী জবাব দিল।

তারপর বলল—এবার ছাড়ো—শরীরটাও ভালো নেই। ঘুম পাচ্ছে খুব। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল—জান—মাঝে মাঝে আমার কিরকম ভয় হয় মনে। আমি নিজেকে বুঝতে পারি না—আমার কিরকম সব গোলমাল হয়ে যায়।

অলক তপতীকে একটু আলতো করে আদর করে বলে—ডোণ্ট ওরি। তোমার কোন ভয়ের কারণ নেই। আমি তো আছি তোমার পাশে। এখন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়।

(৩)

ম্যাগসের টেবিলে টুটিফ্রুটি খেতে খেতে পুরানো অতীতটা সিনেমার পর্দায় ছবির মত তপতীর সামনে ভেসে উঠতে লাগলো। কোথায় পড়েছিল সে—আর আর কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। মনের দীর্ঘদিনের একটা গড়ে ওঠা সংস্কার মাঝে মাঝে তপতীর মনটা ভীষণভাবে নাড়া দেয়। কোনটা উচিত—কোনটা অনুচিত কিছুই ভেবে কুলকিনারা পায় না সে। তবে এ জীবন থেকে বিরাট একটা প্রাপ্তি তাকে যে এক নতুন জগৎ—নতুন জীবনের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তাকেও সে অস্বীকার করতে পারে না।

—হ্যালো—তপু! তুমি এখানে। আর আমি তো কাগজের লস্ট এণ্ড ফাউণ্ড কলামে একটা এ্যাড ছাপাবো ভেবেছিলাম—তপু ফিরে এসো। তোমার অদর্শনে হতভাগ্য নরেন বহেল অক্সিজেন্ নিয়ে কোনমতে ধুঁকতে ধুঁকতে এখনও বেঁচে রয়েছে—তপতীর বয় ফ্রেণ্ড নরেন বহেলের উচ্ছ্বাসে চমক ভাঙল তপতীর।

তপতী বহেলের দিকে একটু মিষ্টি করে হেসে আঙুল দেখিয়ে বসার জন্যে আহ্বান জানাল। তারপর বলল—আগে বল কি খাবে।

—অনেক কিছুই তো খেতে ইচ্ছে করছে ম্যাডাম—কিন্তু চাইলেই বা দিচ্ছে কে—বহেল জবাব দিল।

—ডোণ্ট বি নটি। তুমি আজকাল ভীষণ অসভ্য হয়েছ। ফাজিল কোথাকার

আমি না পরস্ত্রী। রেসপেক্ট দিয়ে কথা বলবে এবার থেকে বুঝেছো। নয়ত কান মুলে দোব। তপতী ছদ্ম ভৎ´সনা করে বহেলকে।

—তোমার মিষ্টি হাতের কানমলা খাবার জন্যে আমি সারা জীবন ধরে শুধু দুষ্টুমিই করে যেতে পারি। ঠিক আছে ফার্স্ট´ লেসেন এখন থেকেই সুরু হয়ে যাগ। দেখি কতদূর প্রগ্রেস করতে পারছি।

—খুব হয়েছে বকতিয়ার খিলজী মশাই। তা অফিস কামাই করে কোন মেয়ের উদ্দেশ্যে পার্ক স্ট্রীটে ঘুরে বেড়াচ্ছো বল দেখি।

—হায় ব্রুটাস শেষে তুমিও একথা বললে। জীবনে আমি প্রথম এবং শেষ একটা মেয়েকেই জানি—আর বলাই বাহুল্য সে হল মিসেস তপতী মুখার্জি।

নরেনের বলার ধরনে খিল খিল করে হেসে উঠে তপতী বলল—খুব মন রাখা কথা বলতে শিখেছো দেখছি আজকাল। দেখা হলেই তো বাবুর প্রেম উথলে পড়ে। কত যে মনে রাখ জানা আছে। কাল সারা সন্ধেটা বাড়ীতে একা একা কাটালাম। একবার আসতেও তো পারতে।

—জান কি কসম তপতী! জানলে কোন শালা না যেত। হায়রে। এতবড় একটা চান্স মিস হয়ে গেল। সারা সন্ধেটা কেবল তুমি আর আমি—দুজনে মুখোমুখি। ঠিক আছে এবার থেকে রোজ সন্ধ্যায় তোমাদের বাড়ির চার ধারে ঘুর ঘুর করে বেড়াব—আর তুমি একা আছো দেখলেই পাঁচিল টপকে লাফিয়ে হাজির হব তোমার সামনে।

—পাঁচিল টপকে কেন? সদর দরজাতো খোলাই থাকছে—তপতী হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে।

—প্রেমিকার কাছে প্রেমিক যাচ্ছে অভিসারে—আর সদর দরজা দিয়ে। পুরো সিকোয়েন্সটাই কাবাবমে হাড্ডি হয়ে গেল। গেট খোলা থাকছে বলেই তো যত গণ্ডগোল। আসলে একটা বাধা না থাকলে প্রেমের ইনটেনসিটিটাই থাকে না। লাফিয়ে ঘরে না ঢুকলে তোমার জন্যে যে জান লড়িয়ে দিচ্ছি সে ব্যাপারটাই তো বোঝান যাবে না।

তপতী হাসতে হাসতে বলে—আচ্ছা ঠিক আছে—লাফিয়েই না হয় এসো

এবার থেকে। তবে মহাশয়—আমি তোমার প্রেমিকা নই, বন্ধু—কথাটাকে কারেকশান করে নিও এবার থেকে।

—অমনি এ্যালার্জী বেড়িয়ে পড়ল গায়ে! প্রেমিকা কথাটার মানে কি—যাকে ভালোবাসা যায় সেই তো প্রেমিকা। আরে বাপু—তোমার সঙ্গে কি আমি প্রেম প্রেম খেলা করতে যাচ্ছি। আচ্ছা তুমি বল—তোমাকে কি আমি ভালবাসি না।

—খুব ফ্ল্যাটারী হয়েছে। অফিসে যদি না যাও তবে চল—গ্লোবে একটা ভাল ছবি হচ্ছে দেখে আসি।

পাঞ্জাবী হলেও নরেন জন্ম থেকেই বাঙলাদেশে। বাঙলাতে পড়াশোনা করেছে। বাঙলা সাহিত্যে তার দখলও ভাল। তপতীর বেশ লাগে নরেনকে। ছেলেটা তাকে ভালবাসে সত্যি। তবে এ ভালবাসার ধরন আলাদা। সুর আলাদা। নরেন ঝরনার জলের মত সবা সময়ই উচ্ছল। মনের সব গুমোটকে নিমেষেই উড়িয়ে দেয় নরেন। মুখে হাসি আর ফাজলামি লেগেই আছে। তাদের সোসাইটিতে নরেনের মত এত সম্মান—এত শ্রদ্ধা তপতীকে আর কেউ করে না। ঠাট্টা ফাজলামী করলেও নরেন তাকে একটা বিশেষ মর্যাদার আসনে বসিয়ে রেখেছে। ছেলেরা সবাই মেয়েদের সত্যিকারের বন্ধু হতে পারে না। নরেন সেই অর্থে তার সত্যিকারের বন্ধু। আর এটা জানে বলেই নরেনকে তপতীর এত ভাল লাগে। নরেন তার একাধারে বন্ধু—একাধারে দেবর—মনের খুব কাছের মানুষ। তপতীর সব কাজে তাই নরেন না হলে চলে না—তপতীর যা কিছু খেয়াল খুশী-মান-অভিমান-আব্দার—সবেতেই নরেন।

সিনেমার পর তপতী গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে দেখে নরেন বলল—তুমি একটা যাতা।

সবিস্ময়ে তপতী প্রশ্ন করে—কেন?

—কেন আবার জিজ্ঞেস করছো। নগদ দশ টাকা খরচা করে ঠাণ্ডা ঘরে তোমাকে সিনেমা দেখালাম। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ একবার জিজ্ঞেসও তো করতে পারতে খিদে পেয়েছে কিনা! সিনেমা দেখা হল আর মেম সাহেব গাড়ি হাঁকাচ্ছেন। মেয়ে জাতটাই স্বার্থপর।

—আচ্ছা বাবা ঘাট হয়েছে। এখন কিন্তু খাবার সময় নেই! পার্টিতে যেতে হবে না? ঠিক আছে বাবুর সিনেমার জন্য খাওয়া পাওনা রইলো।

. তারপর ব্যাগ থেকে একটা টাকা বার করে তপতী নরেনকে বলল— টাকাটা রাখো। ছেলেমানুষ বায়না ধরেছে যখন তখন না হয় এক টাকার চিকলেট কিনে খেতে খেতে বাড়ি যেও। যা বাজে সিনেমা দেখালে তাতে এর বেশি তোমার প্রাপ্য হওয়া উচিত নয়।

নরেন গম্ভীর হয়ে বলল---কৃপণের কাছে যা পাওয়া যায়। ঠিক আছে পারমিশান দিলাম বাড়ী গিয়ে সাজু গুজু করো গে এখন। পার্টিতে তো দেখাই হচ্ছে।

নরেনের কাছে বিদায় নিয়ে তপতী চলে গেল।

(৪)

অলকের অফিসের চীফ পার্সোন্যাল ম্যানেজার মিঃ রাঘবনের ককটেল পার্টি বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। উচ্চপদস্থ প্রায় সব অফিসারের সঙ্গে ম্যানেজিং ডিরেকটার মিঃ মালহোত্র থেকে সুরু করে প্রথম সারির বড় ছোট অফিসার প্রায় সবাই সস্ত্রীক এসেছেন পার্টিতে।

অফিসের পার্টি এক বিচিত্র ব্যাপার। অফিসার গিন্নীরা যে যার রূপ সৌন্দর্য্য আর ন্যাকামির কম্পিটিশনে কে কাকে টেক্কা দিয়ে যাবে তার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। কেউ কেউ আবার অফিসের বড়কর্ত্তাদের নেকনজরে পড়বার চেষ্টায় প্রাণপাত করে থাকে। তাই নিয়ে মিসেসদের ঘরোয়া আসরে নিন্দার ঝড় বয়ে যায়। যিনি নিন্দায় সোচ্চার তিনিই হয়ত আগের কোন পার্টিতে যাকে নিন্দা করছেন তার চেয়ে অনেক বেশি বেহায়াপনা করেছিলেন। এ এক বিচিত্র মনোবৃত্তি—বিচিত্র পরিবেশ।

তপতী আর অলক একটু দেরীতে এসে পৌছাল পার্টিতে। মিঃ রাঘবন সোৎসাহে অভ্যর্থনা জানালেন তাদের। মিঃ মালহোত্র তপতীর হাত দুটো ধরে এসকর্ট করে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকেই তপতীর কোমরটা একটু

আলতোভাবে জড়িয়ে ধরে বললেন—লেডিজ এণ্ড জেন্টল ম্যান! আই নাউ প্রেজেন্ট ইউ দি লাভলি এ্যানজেল ফ্রম দি হেভেন—মিসেস তপতী মুখার্জি। সি ইজ লুকিং টেরিফিক টুডে। আই ক্যানট রেসিসট গিভিং হার এন এফেকশনেট কিস।

সামলে নেবার আগেই মিঃ মালহোত্র তপতীকে আওয়াজ করে একটা চুমু খেলেন গালে। উপস্থিত সবাই হেসে উঠলো। মালহোত্রার বয়স ৫৪।৫৫। মাথাজোড়া টাক। শরীরে এ্যালকোহল জনিত মেদের বাহুল্য। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক পেগ চড়িয়েছেন।

তপতীর প্রতি মালহোত্রার এই বিশেষ মনোযোগে অলক মনে মনে খুশী হল। তপতী একটু লজ্জা পেল বটে তবে ভদ্রতা রাখার জন্যে সলজ্জ ভঙ্গীতে বলল—থ্যাঙ্কস ফর দি কমপ্লিমেণ্ট।

উপস্থিত অনান্য মহিলারা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মিসেস ট্যাণ্ডন ফিস ফিস করে মিসেস মিত্রকে বললেন—এবার অলক মুখার্জির স্পেশাল ইনক্রিমেণ্ট কে আটকায়।

মিসেস মিত্র অনেকদিন ধরে মালহোত্রর নেকনজরে পড়ার চেষ্টা করে সফল হন নি। তাই মিঃ মিত্রকে এখনো দুহাজারে পড়ে থাকতে হয়েছে। এ কোম্পানীর ব্যাপারে অন্তত একটা কথা সবাই বুঝে ফেলেছে এতদিনে যে এখানে যোগ্যতা দক্ষতার কোন দামই নেই। ভাগ্যোন্নতির মূল চাবি কাঠি হল মিঃ ভি. মালহোত্রর পদবন্দনা।

মনে মনে তাই তপতীর প্রতি মিসেস মিত্রের জেলাসী অন্যের চেয়ে একটু বেশি। মুখটা বেঁকিয়ে জবাব দিলেন—হবে না কেন? অলক বাবু বউকে টোপ ফেলেছেন যে। আমরা তো ও রকম হতে পারি না। ঘেন্না করে। সবার সামনে যখন জড়িয়ে ধরে কিস করলো তখন আড়ালে আর কিছু বাকী রাখবে নাকি! মালহোত্রকে চেনেনা। নজর পড়েছে যখন তখন সহজে ছেড়ে দেবে না।

অফিসের রিসেপসনিস্ট ছন্দা বিশ্বাস মালহোত্রার নৈশ সঙ্গিনী হিসেবে

বিশেষ পদাধিকার বলে অফিসের সব পার্টিতেই স্পেশাল ইনভাইটি। তপতীর প্রতি ছন্দার একটু সফট কর্ণার আছে মনে। মিসেস মিত্রকে দেখতে পারে না ছন্দা। তাই তাকে আরো বেশী করে জ্বালাবার জন্যে বলে—তা যাই বলুন – তপতীর মত সুন্দরী এখানে তো দ্বিতীয় কেউ নেই। আর সুন্দরী মেয়েদের প্রতি পুরুষদের পক্ষপাতটা একটু বেশীই হয়ে থাকে। সাজতেও জানে তপতী।

আঘাতটা মিসেস মিত্রের মরমে গিয়ে লাগে। মিসেস মিত্র সুন্দরী তো ননই—সাজগোজেও রুচির অভাব পরিষ্কার। তবে আধুনিকতার প্রতিযোগিতায় ছাড়িয়ে গেছেন সবাইকে। মালহোত্রার কাছে ছন্দার পজিশনটা জানা থাকায় আর কথা বাড়ান না। রাগে ফুসতে ফুসতে টেবিলে পড়ে থাকা সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকেন মিসেস মিত্র।

সাজতে শিখেছে বটে তপতী! ম্যাচিং করা শাড়ীর সঙ্গে লো কাট ব্লাউজে উদ্ধত যৌবন সি থ্রু শাড়ী ভেদ করে ফেটে পড়তে চাইছে। পাতলা শাড়ীর আবরণে ব্লাউজের তলা থেকে নিম্ন নাভির দীর্ঘ মেদহীন মসৃণ মালভূমি মোহনীয় করে তুলেছে তপতীকে। রূপোর ম্যাচ করা দুল, হার, কোমরের বিছে আর পায়ের মল। সব মিলিয়ে তাকে কোণারকের ভাস্কর্যের মত মনে হচ্ছিল। তপতীবেশ বুঝতে পারছিল উপস্থিত পুরুষের সবাকার চোখ তার ওপরেই পড়ে আছে। মদের নেশা কেটে গিয়ে তপতীর নেশায় তারা পাগল হয়ে গেছে। মনে মনে উল্লসিত হয় তপতী। পুরুষদের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে নিজেকে রাজেন্দ্রাণীর মত মনে হয় তার।

এক ফাঁকে নরেন বহেল চুপি চুপি তপতীকে একা চিমটি কেটে ফিস ফিস করে বলল—কালই আমি রাঁচির টিকিট কাটছি।

—এত জায়গা থাকতে রাঁচি কেন—বিস্ময়ে তপতী জিজ্ঞেস করে।

—তুমি এখনও জিজ্ঞেস করছো—কেন রাঁচি যাব। তোমার এই সাজের পর আমার মাথার কিছু ঠিক আছে ভেবেছো। ইচ্ছে করছে সকলের সামনেই তোমায় জড়িয়ে ধরি।

—অসভ্য কোথাকার। নরেনকে থামিয়ে তপতী ছদ্ম ভর্ৎসনা করে বলে—পরের জিনিসের প্রতি লোভ করতে নেই জান না।

আক্ষেপ করে নরেন বলে—শালা—আমাকে কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেকটর হতেই হবে। মোটা মালহোত্র কী রকম স্মার্টলি সকলের সামনে জড়িয়ে ধরে তোমায় চুমু খেল। ইচ্ছে করেছিল হোৎকাটার মুখে একটা ঘুঁসি বসিয়ে দি।

তপতী মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলল—অত জেলাসী কেন। পিতার বয়সী লোক। নেশার ঝোঁকে স্নেহটা একটু বেশী উথলে উঠেছিল আরকি। তারপর চোখ পাকিয়ে বলল—ছেলের মুরোদ কত—ম্যানেজিং ডাইরেকটর হবেন বাবু। আগে এই চাকরীটাই সামলাও।

অতিথি সৎকারে মিঃ রাঘবন এগিয়ে আসেন—কি খাবেন মিসেস মুখার্জি—হুইস্কি।

প্রৌঢ় রাঘবন অলকের অফিসের সত্যিকারের ভদ্রলোক। মেয়ে ছেলের নেশা নেই। মদ আর কাজ ছাড়া অন্য কিছু জানেন না। রাঘবনকে তপতীর বেশ ভাল লাগে।

তপতী জবাব দেয়—আমায় বরং একটা ড্রাই ম্যাটিনি দিন।

—আজকের দিনে ড্রাই ম্যাটিনি—এক কোন থেকে ছুটে আসেন মিঃ মালহোত্র। বললেন—ফর মাই সেক মিসেস মুখার্জি—আজ একটা কনিয়াক খান।

—থ্যাঙ্কস ফর দি সাজেশান—ঠিক আছে মিঃ রাঘবন—কনিয়াক। তপতী জবাব দেয়।

মালহোত্র দুচোখ দিয়ে তপতীর শরীরটা চাখতে চাখতে বললেন—দ্যাটস লাইক এ গুড গার্ল। নেক্সট উইকে তুমি আর অলক আমার বাড়ীতে স্পেশাল গেষ্ট। নিমন্ত্রণ রইলো। ইমপোরটেড হুইস্কি খাওয়াব।

—ধন্যবাদ। মিষ্টি করে জবাব দেয় তপতী।

তপতী এবার মেয়ে মহলের দিকে এগুলো। মাঝপথে চন্দ্রশেখর তপতীকে বলল—আপনি আজ সবাইকে হারিয়ে দিয়েছেন। দারুণ লাগছে আপনাকে।

—আস্তে চেঁচিয়ে বলবেন না—মিসেস চন্দ্রশেখর কথা বন্ধ করে দেবে আপনার সাথে। তপতীর জবাবে লজ্জা পেয়ে চন্দ্রশেখর চুপ করেগেল।

পরস্ত্রীর প্রতি এই হ্যাংলামি দেখতে দেখতে তপতী মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে ওঠে। নিছক প্রশংসা হলে কোন কথা ছিল না--কিন্তু অভিজ্ঞতায় তপতী জেনেছে ওদের মনের আসল চেহারাটা। ওদের লোভটাই আসল। সুযোগ পেলেই থাবা উঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এ সমাজে স্ত্রীরা তাদের স্বামীর অর্থ ছাড়া অন্য কিছু বোঝেনা। পর পুরুষদের সঙ্গ এদের কাছে একটা ফ্যাশানে দাঁড়িয়ে গেছে। আর এদের স্বামীরা স্ত্রীদের ভালবাসা আর সাহচর্য না পেয়ে পরস্ত্রীর সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি করে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে চায়। এটাই নিয়মে দাড়িয়ে গেছে।

গভীর রাত্রে পার্টি ভাঙলে অলক তপতীকে নিয়ে গাড়িতে উঠলো। অলককে আজ ভীষণ খুশী খুশী লাগছিল। গাড়ি চালাতে চালাতে অলক বলল—সত্যি তপু। তোমাকে যা লাগছে না আজ।

তপতী হঠাৎ ফোঁস করে ওঠে--সকলের মত আমার দেহটাকেই চিনলে তুমি।

মাঝে মাঝে তপতীর কি যেন হয়ে যায়। আনন্দ কোলাহলের মাঝে হঠাৎ হঠাৎ তপতীর মনের সুর কেটে যায়। তপতী ঠিক কি যে চায় অলক বুঝতে পারে না। তবু বলল—স্বামী হয়ে তোমাকে একটু প্রশংসাও করতে পারব না।

—আর প্রশংসায় কাজ নেই—তোমাদের সোসাইটির পরিবেশে মাঝে মাঝে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে—আই গো আপসেট।

—তোমার তো খুশী হবার কথা তপু। অফিসের সবাই তোমাকে কিরকম প্রেইজ করছিল বলতো। আই এ্যাম প্রাউড অফ ইউ তপু—বিলিভ মি।

—দেখ আবার এ নিয়ে পরে ভেতোবাঙালী স্বামীর মত যেন হা হুতাশ কোরোনা।

—হাহুতাশের কোন ব্যপার নেই তপু। আজকের পারমিসিভ সোসাইটিতে সামান্য একটু আধটু ব্যপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। এটা ফান ছাড়া তো আর কিছুই নয়। মালহোত্র তোমার বাবার বয়সী। ওর ব্যবহারে দোষ ধরতে নেই। তোমাকে উনি কত স্নেহ করেন জাননা—প্রায়ই তোমার প্রশংসা করেন আমার কাছে।

—যাগ তোমার এ দিব্যজ্ঞানটা শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পারলে ভালই। আমার আর কি! যে ভাবে চালাবে সেই ভাবেই চলবো। পরে কষ্টটা তুমি ই পাবে বেশী।

আলতোভাবে তপতীর হাতে একটু চাপ দিয়ে অলক পরিবেশটা হাল্কা করার জন্য বলে—তপু—তোমায় কোনদিন আমি ভুল বুঝতে পরি!

তপতী কথা বলে না। ভাবে সত্যিইতো। জীবনের ঐশ্বর্য, সোসাইটিতে সম্মান-প্রতিপত্তি সবইতো আস্তে আস্তে তাদের করায়ত্ত হতে চলেছে। নারী জীবনে এর চেয়ে বড় পাওনা আর কি থাকতে পারে। সহসা তপতীর নিজেকে খুব ভাল লাগে। বাঘা বাঘা পুরুষগুলোকে পায়ের তলায় তার হুকুমের আশায় নতজানু হয়ে বসে থাকবার ছবিটা কল্পনা করে উল্লসিত হয় তপতী মনে মনে। পুরুষদের ওপর এই ভাবেই তো যুগে যুগে সুন্দরী নারীরা তাদের দেহের পাত্ত পাত অস্ত্র ছুড়ে আধিপত্য করে গেছে। তাদের মুখের কথায় জীবনের সর্বস্ব ঘুচিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে মুর্খ পুরুষের দল। এই দেহটাই তো সব।

বাড়ী ফিরে খুশী মনে জামা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে আয়নায় তপতী নিজের সুন্দর দেহটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে॥

(৫)

অলক মালহোত্রার সঙ্গে অফিসের এক জরুরী কাজে দিল্লী গেছে। ফিরতে ৩।৪ দিন লাগবে। ঘুম থেকে উঠে তপতী চা খেতে খেতে ভাবছিল এ কটা দিন কি করবে। তপতীর মেজ মাসী বরানগরে থাকেন। অনেকদিন থেকে

বলছেন যাবার জন্যে। সময় হয় না তপতীর। ভাবলো আজ বিকেলে মেজমাসীর বাড়ী বেড়াতে যাবে।

তপতীর বাবা তার বিয়ের পরের বছরেই মারা যান। মা ছোট ভাইকে নিয়ে দেশেতেই থাকেন। আগে মাঝে মাঝে মেয়ের কাছে আসতেন। মেয়ে আজকাল মেম সাহেব হয়েছে বলে আর আসেন না। তপতীর একমাত্র ভাই তাপস দেশেরই স্কুলে মাষ্টারী করে।

মার কাছেই তপতী শুনেছিল অরুণ নাকি তাদের শহরের কাছেই নিরাশ্রয় অনাথদের জন্যে একটা আশ্রম করেছে। হোমিওপ্যাথি শিখে গ্রামে গ্রামে গরীবদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে বেড়ায়। বিয়ে থা করেনি। বাড়ীর লোকেরা জোর করে করে এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। মাকে বেশী জিজ্ঞেস করতে লজ্জা হয়েছিল তপতীর। তাই ভাইকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিল যে অরুণ নাকি ছাত্রজীবনে কাকে ভালবাসতো। ভালবাসায় সফল হয়নি বলে এরকম ছন্নছাড়া, বাউণ্ডুলে হয়ে পড়েছে।

তাপস আরো বলেছিল—জানো দিদি—অরুণদাকে দেখলে মায়া লাগে। স্কলারশিপ পাওয়া জেলার সেরা ছাত্র—আই এ, এম এ, কৃতকার্য হয়েও চাকরী বাকরী নেয়নি। বাবা-মার একমাত্র সন্তান। তারা খুব দুঃখ পেয়েছেন।

শোনা অবধি তপতীর মনের ভেতরটা জ্বালা করে উঠেছিল। একলা থাকলেই অরুণের কথা ভেবে মনটা অশান্ত হয়ে যায় তপতীর। কিছু আর ভাল লাগে না। অরুণের এ অবস্থার জন্যে সে যে পরোক্ষভাবে দায়ী এ বেদনা বোধটা তাকে অস্থির করে তোলে। অরুণের কথা মনে হলেই তপতীর বুকের ভেতর একটা চাপা যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে ওঠে। জীবনের প্রথম প্রেম মেয়েরা বোধ হয় কোনদিন ভুলতে পারে না। পরবর্তী জীবনে শত কাজের —শত ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে মনের গোপন গহ্বর থেকে পুরানো দিনের স্মৃতিটা চোখের সামনে জল জল করে ওঠে।

অরুণের সঙ্গে বিয়ের পর মাত্র একবারই কয়েক মুহূর্তের জন্যে তপতীর দেখা হয়েছিল দেশে।

অরুণ জিজ্ঞেস করেছিল—আরে তপু যে। বেশ গিন্নী গিন্নী লাগছে তোমায়। তা কর্তাকে দেখছিনা সঙ্গে। কেমন আছো।

বিয়ের পর তপতীর আগের সেই লজ্জা সংকোচ অনেক কেটে গিয়েছিল। একটু মিষ্টি হেসে জবাব দিয়েছিল—কর্তা কাজের জন্য আসতে পারেনি। আসুন না একদিন বাড়িতে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি আর কথা বলা যায়।

জবাবে অরুণ বলেছিল—কথা বলার দিন আমার ফুরিয়ে গেছে তপতী। তুমি সুখী হয়েছো—এর চেয়ে বড় আনন্দ আমার আর কি থাকতে পারে।

একটা নিস্ফল বেদনা তপতীর বুকে মোচড় দিয়ে উঠেছিল। জল এসে গিয়েছিল তপতীর চোখে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল—অরুণ দা—যে অতীতটা মরে গেছে তাকে অযথা জিইয়ে রাখবেন না—তাতে মনের বোঝা বেড়েই যাবে। তার চেয়ে একটা বিয়ে করে ফেলুন— দেখবেন অনেক ভাল লাগবে।

পরিবেশটা হাল্কা করে দেবার জন্যে আরো বলেছিল—বলুনতো মেয়ে দেখি। একটা রাঙা টুকটুকে বউ জোগাড় করে দোব। আপনার সঙ্গে মানাবে ভাল।

অরুণ আর কথা বাড়ায়নি। শুধু বলেছিল, পৃথিবীতে যাদের কেউ নেই—তাদের কথা তুমি বুঝবে না। আজ চলি—যদি কোনদিন প্রয়োজন হয় তবে আমাকে ডেকো সঙ্কোচ করে থেকো না। অবশ্য আমার মত গাঁইয়াকে তোমার কোন কাজে লাগবে না জানি—তবু মনে হল কথাটা তাই বললাম।

তপতীর চোখে জল এসে গিয়েছিল। কোনমতে অরুণের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়িয়ে ছিল।

আজ একলা বসে বসে অরুনের কথা চিন্তা করে তপতীর খুব খারাপ লাগছিল। অরুণের প্রেমের আত্মত্যাগ তাকে বিহ্বল করে তুলেছিল। ভাবতে ভাবিতে তপতীর আর কিছুই ভাল লাগছিল না।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো। অপর প্রান্ত থেকে নরেন বহেলের গলা ভেসে

এল—আমি কি সুন্দরী শ্রেষ্ঠা পরস্ত্রী শ্রীমতী তপতী মুখার্জির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেতে পারি?

নরেনের বলার ধরণে তপতী হেসে ফেললো। মনের বেদনায় সান্ত্বনার প্রলেপ পড়ল একটু। ছদ্ম কোপে জবাব দিল তপতী—একটা চাঁটি লাগাব। কিন্তু জ্যোতিষ মশাই—অমি তো জবাব দিইনি, তুমি বুঝলে কি করে যে আমি ফোন ধরেছি।

—নিছক উইল ফোর্স মহাশয়া। আরে বাবা আমি ফোন করছি—আর তুমি না ধরে পার কখনও। আসলে কি জান—ঘুম থেকে উঠেই তোমার মিষ্টি মুখটা মনে পড়ে গেল। হঠাৎ খেয়াল হল আমার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ অলক মুখার্জি হোৎকা মালহোত্রার সঙ্গে এখন দিল্লী শহর দাবিয়ে বেড়াচ্ছেন। আর মিঃ মুখার্জির বিরহ কাতরা সুন্দরী স্ত্রী একাকিনী শোকাকুলা হয়ে আনমনা দিন যাপন করছেন। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে পুরুষ হিসেবে অবলা অসহায় রমনীকে রক্ষা করার অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য বোধে চা না খেয়েই তোমার কুশল সংবাদ নিতে উদ্যোগী হলাম।

তপতী হেসে উঠে বলল—তা বুঝলে কি শেষ পর্যন্ত?

—তোমাকে ফোনে পেয়ে আশ্বস্ত হলাম যে তোমার একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে বাড়িতে এসে বলপূর্বক অন্তত: কেউ তোমায় হরণ করে নিয়ে যায় নি এখনও। অতএব নিশ্চিন্ত মনে চা খাওয়া যেতে পারে।

—অবলা নারীর রক্ষার জন্য যদি প্রাণে এতই দরদ তবে চা টা না হয় এখানে এসেই খেলে। চাও খাওয়া হবে আর পাহাড়াও দিতে পারবে।

—তোমার ঐ বীণানিন্দী কণ্ঠস্বরে আর একবার আহ্বান জানাও সুন্দরী। নরেন বহেল ভাগীরথির জলের ওপর দিয়ে পাতাল রেলের গহ্বর ভেদ করে দশ মিনিটের মধ্যে তোমার চরনে বডি ফেলে দেবে।

তরল কণ্ঠে তপতী জবাব দেয়—মনে হচ্ছে তুমি একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছো।

থিয়েটারী ভঙ্গীতে নরেন জবাব দেয়—এখনও সন্দেহ তব পাষানী

নারী। হনুমানের মত যদি বক্ষ চিরিয়া দেখাতে পরিতাম তবে দেখিতে সেখানে সূর্যের মত জ্বল জ্বল করছে একটি নাম—সে তপতী।

—এসব বস্তাপচা স্তুতি বাক্যে কি আর পরস্ত্রীর মন গলে। খুব ফ্লাটারি করতে শিখেছো আজকাল। তা আমার পেছনে অযথা এত তেল খরচ না করে মালহোত্রার পায়ে ঢাললে তো প্রমোশন পেয়ে যেতে এতদিনে।

ছদ্ম আক্ষেপে নরেন বলল—সত্যি তো! এটা তো ভেবে দেখিনি এতদিন। আসতে দাও মালহোত্রাকে। কলকাতার সব অয়েল মিল এবার থেকে তার পায়ে ঢেলে দোব।

—বাবুর ভালবাসর দৌড়টা বোঝা গেল শেষ পর্যন্ত, তা রামভক্ত হনুমানজী চায়ের জল চরাতে বলেছি—এখন দয়া করে টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে চলে এস তাড়াতাড়ি।

—আরে আসল কথাটাই তোমাকে বলা হয়নি। রাত্রে কোন কাজ রেখো না। ডিনার খাবে আমার সঙ্গে।

—হঠাৎ ডিনার কি সুবাদে, পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেমের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছো বলে নাকি।

---কি নসিব দেখ। ফাঁকা মাঠে আজকে একটা গোল করব ভাবলাম তা না রেফারী ওয়াক ওভার দিয়ে দিল। কেন ডিনার খাওয়াব এখন বলব না।

— ঠিক আছে বোলো না। আরে বাবা ৯টা বাজে ব্রেক ফাষ্ট খাইনি এখনও ভীষণ খিদে পেয়েছে। তাড়াতাড়ি চলে এসো।

তপতী ফোন ছেড়ে দিল। বাবুর্চিকে ডেকে দুজনের মত ব্রেক ফাষ্টের অর্ডার দিয়ে স্নান করতে গেল।

(৬)

মালহোত্রার সঙ্গে অফিসের কাজে অলক দিল্লী এসেছে। মালহোত্রার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মত সঙ্গে এসেছে ছন্দা বিশ্বাস। পাঁচ তারা হোটেলের বিলাস বহুল আরাম কক্ষে মালহোত্রা অলককে আহ্বান জানালেন।

মালহোত্র অলকদের কোম্পানীর শুধু ম্যানেজিং ডিরেকটারই নন—বেনামী শেয়ারের হেরা ফেরিতে তাদের কোম্পানীর আসল মালিকই হচ্ছে মালহোত্রা ধনী পিতার একমাত্র সন্তান। পাঞ্জাব এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর সম্পত্তি মালহোত্রের ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। দিল্লী, বোম্বাই-কলকাতার টপ সোসাইটিতে মালহোত্রর প্রবল প্রতিপত্তি—প্রচণ্ড প্রভাব।

মালহোত্রার ৩৭।৩৮ বছর বয়সে স্ত্রী হঠাৎ মারা যান। দুষ্টু লোকেরা বলে উশৃঙ্খল জীবনের একমাত্র বাধা স্ত্রীকে নাকি মালহোত্র নিজেই কৌশলে হত্যা করেছে। স্ত্রী মারা যাবার পর মালহোত্রার জীবনে যে সামান্য একটু বাধা ছিল তা আর রইল না।

অফিস ছাড়া মালহোত্র ক্রমেই মদ আর নতুন নতুন মেয়ের নেশায় মেতে উঠলেন।

মালহোত্র সেই ধরনের লোক যাদের ধারনা টাকা থাকলে যে কোন মেয়েকে করায়ত্ত করা যেতে পারে। তবে মেয়েদের পেছনে টাকা ছড়াতে কার্পণ্য করেন না মালহোত্র। তিনি যে সমাজে মেশেন সেখানে নারীত্ব সতীত্ব নামক মেকি সংস্কারগুলো অতীতের মরা ফসিল মাত্র। পারমিসিভনেসে আজকের সমাজে মরালিটির সংজ্ঞাই পাল্টে গেছে। পতঙ্গ ধরবার জন্যে আজকের দিনে আর ছোটাছুটির প্রয়োজন হয় না—পয়সার গুণগত বিচারে পতঙ্গরা আপনা হতেই আগুণে ঝাঁপ মারতে আসে। তাদের কাছে দেহটা অনেকটা জামা কাপড়ের মত, দাগ লাগলে সহজেই লণ্ড্রীতে পরিস্কার করে ফেলা যায়।

মালহোত্র অবশ্য কোন এক বিশেষ পাত্রীতে দীর্ঘদিন মনযোগ দেওয়া পছন্দ করেন না, নতুন নতুন আবিষ্কারের নেশায় বন্দর থেকে বন্দরে ঘোরাফেরা করেই তার আনন্দ। অভিজ্ঞতায় মালহোত্র বুঝেছিলেন তপতী তাদের সোসাইটিতে কিছুটা প্রক্ষিপ্ত। আধুনিকা হবার চেষ্টাতে পুরানো সংস্কারটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি এখনও। মালহোত্র বুঝেছিল তপতী বড় শক্ত ঘাটি। এ যুদ্ধ জয়ে তাকে অনেক কৌশল, অনেক তুণ খরচা করতে হবে। তাই তপতীর প্রতি তার আকর্ষণ বেড়েই গেছে দিনে দিনে। মালহোত্র যোদ্ধা পুরুষ। বাধা না আসলে সংগ্রাম করতে আনন্দ পান না। তাই অনেক মাথা খাটিয়ে একটা ফুল

প্রুফ পরিকল্পনা নিয়েছেন যাতে তপতীর মত শক্ত মেয়েকে জিতে বাজীমাত করা যায়। কাম্য বস্তুকে না পাওয়া পর্যন্ত থামতে জানেন না মালহোত্র। বাধা পেলে জেদটা তার বাড়তেই থাকে।

মালহোত্র বুঝেছিলেন যে তপতীর স্বামী অলক মুখার্জি জীবনে বড় হবার স্বপ্নকে সার্থক করতে যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত আছে। তার লোভের মাত্রাটাকে আস্তে আস্তে তাই বাড়বার সুযোগ করে দিয়েছেন মালহোত্র। পেট রোগা ক্ষুধার্ত লোক যেমন খাবার পেলে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে খেতে আরম্ভ করে অলকের মনের অবস্থাটা মালহোত্র সেই পর্যায়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। তারই প্রস্তুতি হিসেবে জুনিয়র অফিসার অলককে একটা স্পেশাল এসাইনমেণ্ট দিয়ে দিল্লী নিয়ে এসেছেন মালহোত্র।

ছন্দাকে স্ট্রাটেজীটা ভালকরে বুঝিয়ে দিয়েছেন মালহোত্র। জীবনের নানান কুকাজে ছন্দা তাকে সাহায্য না করলে মালহোত্র সব ব্যাপারে এতটা সফল হতে পারতেন না। মালহোত্র অকৃতজ্ঞ নন, ছন্দার দেহ এবং সহযোগিতা প্রাপ্তির পুরস্কার স্বরূপ একটা তিন ঘরের ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছেন, দশহাজার টাকার একটা ফিক্সড ডিপোজিট করে দিয়েছেন ব্যাঙ্কে॥

ছন্দার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা এখন একটা বিজনেস পার্টনারের মত। ছন্দাও জানে মালহোত্র তাকে যতদিন প্রয়োজন তার বেশীদিন পাত্তা দেবে না। তাই সময় থাকতে ছন্দা মালহোত্রের কাছ থেকে যতটুকু আদায় করা যায় তার আশায় আরো বেশী প্রয়োজনীয় করে তুলতে চেষ্টা করে নিজেকে॥

মালহোত্র জানেন যে অলকের মনে বড় হবার লোভের সঙ্গে তার গোপন কোন দুর্বলতার কিছু সাক্ষী রেখে না দিতে পারলে তাকে পুরোপুরি কাবু করা যাবেনা। জীবনে এমন কোন নোংরা কাজ নেই যে মালহোত্র করেন নি। তাই বিদেশী হুইস্কির বোতল খুলে ছন্দাকে দিয়ে অলককে ডেকে পাঠালেন মালহোত্র।

অলক ঘরে ঢুকতেই মালহোত্র তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আই এ্যাম প্রাউড অফ ইউ অলক। আজকের মিটিং এ তুমি যে ভাবে আমাদের

কোম্পানীর কেসটা প্রেজেন্ট করলে তাতে আমার মনে হচ্ছে তোমাকে একটা বড় রকম কিছু প্রমোশন না দিলে অন্যায় করব আমি।

একটা খুশীর পুলকে অলকের সারা দেহে শিহরন খেলে গেল। আবেগে অলক শুধু বলল, স্যার সবই আপনার কৃতিত্ব।

—তাহলেও তুমি আজ যা করেছো তা আমি মনে রাখবো। বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সামনের সপ্তাহের মিটিং-এ তোমাকে পার্সোন্যাল ম্যানেজারের পোস্টটা দেবার জন্যে প্রস্তাব দোব। মিঃ বিশ্বাস আর ঠিকমত কাজ চালাতে পারছেন না। তুমি তো জানোই বোর্ডের কোন মেম্বারই মালহোত্রার ডিশিসনের ওপর কথা বলেনা।

বিনয়ে বিগলিত হয়ে পড়ে অলক। মালহোত্রকে তার দেবতা বলে মনে হয়। ওষুধ ধরেছে দেখে মালহোত্র বললেন, আই লাইক ইউ। আমি নিশ্চয় দেখবো- তুমি যাতে অনেক-অনেক বড় হয়ে উঠতে পারো। আই এ্যাম জাস্ট লাইক ইওর ফ্রেণ্ড। তপতীর মত স্ত্রী যার তার জীবনে অনেক উন্নতি করা উচিত —বড় না হলে তাকে সুখে রাখবে কি করে।

অলক জবাব দিতে পারেনা। একটু পরে মালহোত্র বললেন, ভালকথা আমাদের কোম্পানীর পি, আর, ও-র পোস্টটা তো খালি রয়েছে। ভাবছিলাম যে তোমার যদি আপত্তি না থাকে তবে তপতী না হয় কাজটা করুক আপাততঃ। তোমাদের একটা এ্যডিশনাল ইনকামেরও ব্যাবস্থা হয়ে যাবে। লেখাপড়া শিখে চুপচাপ বাড়ি বসে থাকার কোন মানে হয়? তা ছাড়া বছরে একবার কোম্পানীর খরচায় যাতে তোমরা দুজনে বিজনেস টুরে বিদেশে ঘুরে আসতে পারো সে ব্যাবস্থাও করে দোব আমি। তপতী ইজ এ নাইস গার্ল। আই লাইক হার।

চমকের পর চমকে অলক বোবা হয়ে যায়। ভাবে এই মালহোত্রাকে লোকে অযথা নিন্দে করে। তার মত একজন সামান্য ব্যক্তিকে এত স্নেহ করেন তিনি। তপতীর ওপর রাগ হয় অলকের। মালহোত্র সম্পর্কে তপতীর মনের সন্দেহটাকে অলক এখন আর ভাল চোখে দেখতে পারে না। সত্যি মালহোত্র সম্পর্কে সে কত ভুলই না ভেবে এসেছে এতদিন।

জবাবে অলক বলে, স্যার আমি নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। কলকাতা ফিরেই তপতীকে জানাব সব। তপতী আপনাকে শ্রদ্ধা করে খুব। একদিন তো আপনাকে বাঙালী রান্না করে খাওয়াবে বলছিল। আমারই স্যার সাহস হয়নি বলতে।

মালহোত্র বুঝলেন যে অলক তার মন রাখার জন্যে মিথ্যে কথা বলছে। তবে ওষুধের ক্রিয়া স্থরু হয়ে গেছে দেখে তৃপ্তি পেলেন মনে। বললেন, এখন আমি এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি আজ রাতে আর ফিরব না। তুমি আর ছন্দা রইলে। এনজয় ইওরসেলফ মাই বয়। ছন্দা ইজ এ কিউট লিটল বেবী—ইউ গট টু নো হার ইনটিমেটলি।

তারপর অলকের হাতে আলতো করে একটু চাপ দিয়ে বললেন, বিদেশে এসেছো ঘরের মায়ায় আটকে পড়েথেকো না। কালতো আমরা কলকাতা ফিরবো। এনজয় লাইফ। জীবনকে জানো, অভিজ্ঞতার বিস্তার না হলে জীবনে বড় হতে পারবে না যাবার সময় মালহোত্র ছন্দার দিকে চেয়ে একটু চোখ টিপলেন।

মালহোত্র চলে যেতেই ছন্দা বলল, বিশ্বাস করুন মিঃ মুখার্জি মালহোত্রকে এত উদার হতে আগে কখনও দেখিনি। নজর যখন পড়েছে তখন এতবড় স্থযোগটা হাতছাড়া করবেন না। বুঝছেন তো সব, এরা সব বড় বড় মাহুষ। এদের ইচ্ছেয় অনিচ্ছায় জীবনের চেহারাই পাল্টে যেতে পারে। তপতীকেও বলবেন যতদিন না আপনার প্রমোশন আর তপতীর চাকরীটা পাকা না হয়ে যায় ততদিন যেন মালহোত্রার সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহার করার চেষ্টা করে।

—সত্যি! মিস বিশ্বাস, বিশ্বাস করুন মালহোত্র যে এত ভালো লোক আগে বুঝতে পারিনি।

চার পেগ হয়ে গিয়েছিল। অলক উঠতে যাচ্ছে দেখে ছন্দা বলল, কি ব্যাপার উঠছেন যে! তপতীর জন্য মন কেমন করছে নাকি। আরে মশাই চার বছর হল বিয়ে হয়েছে। এখন আর বউয়ের আঁচলের তলায় লুকিয়ে থাকবেন না।

অলককে জোর করে বসিয়ে দিয়ে ছন্দা মোহনীয় কণ্ঠে বলল—আজ সেলিব্রেট করব না। এতবড় একটা অফারের পর সেলিব্রেট না করলে ভাল লাগে কখনও। বি.এ গুড বয় মিঃ মুখার্জি, বিদেশে একাকিনী যুবতী নারীকে ফেলে আপনি চলে যাচ্ছেন। ডোণ্ট বি সো ক্রয়েল মিঃ মুখার্জি। হ্যাভ এ হার্ট।

তারপর পাত্রে দু পেগের মত পানীয় নিয়ে নিজের সোফা ছেড়ে ছন্দা অলকের পাশে গা ঘেঁসে বসে বলল, দেখি আজ আপনি কতটা স্ট্যাণ্ড করতে পারেন। অলকের চুলে বিলি কেটে ছন্দা বলল আই লাইক ইউ অলক। আই এনভী তপতী। তারপর মুখটাকে অলকের দিকে তুলে বলল—কিস মি হ্যাণ্ডসাম।

ছন্দার শরীরের মিষ্টি গন্ধ—নরম বুকের আলতো চাপ অলককে খালি তপতীর কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল। অলককে চুপ করে থাকতে দেখে ছন্দা অভিমান ভরা কণ্ঠে বলল—ভাল লাগছে না বুঝি আমাকে। আমি তো আর তপতীর মত সুন্দরী নই। কিন্তু একেবারে ফেলনাও নই মশাই।

ছন্দা অলকের আরো কাছ ঘেঁসে এসে বসল। ছন্দার নিঃশ্বাস অলকের গালে এসে লাগছিল। মদের নেশা, যুবতী নারীর ঘনিষ্ট সান্নিধ্য সব মিলিয়ে অলকের মাথায়রক্ত চড়ে যাচ্ছিল। কি করবে অলক ভেবে পাচ্ছিল না।

মোহময়ী ভঙ্গীতে ছন্দা বলল, যুবতী নারীকে প্রত্যাখ্যান করতে নেই ইট ইজ এগেনষ্ট কার্টেসি। কিস মি মাই হ্যাণ্ডসাম, আই এ্যাম ম্যাডলি ইন লাভ উইথ ইউ টুডে।

ছন্দার বুকের শাড়ি খসে গিয়েছে। লো কাট ব্লাউজের ওপর দিয়ে বুকের অনেকখানি অনাবৃত অংশ লোভনীয় হয়ে দেখা যাচ্ছে। ছন্দার একটা হাত অলকের গলায় জড়ানো। নরম শরীরটা অলকের গায়ে লেপ্টে রয়েছে। অলক আর থাকতে না পেরে ছন্দাকে জড়িয়ে ধরল। তপতীর মুখটা আর মনে করতে পারল না অলক। তার সারা চেতনায় তখন ছন্দা আগুণ জ্বালিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু অলক জানলো না যে মালহোত্রার বিশেষ নির্দ্দেশে এক ফটোগ্রাফার সেই রাত্রে ছন্দা-অলকের নৈশ রতির ধারা বিবরণী চিত্রে গেঁথে নিচ্ছে।

বাড়ি কাঁপিয়ে ঝড় তুলে দুপদাপ করে নরেন এসে হাজির হল তপতীদের বাড়ি। তপতী তখন রান্নাঘরে রান্নার নির্দেশ দিচ্ছিল। বেরিয়ে এসে বলল, তাই বল তুমি! আমি তো ভাবলাম বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। তা আগমনের এত সদম্ভ ঘোষণা কেন! রাজ্য জয় করে এলে মনে হচ্ছে!

নরেন কথা না বলে ফরাসী কায়দায় বাউ করে তপতীর হাতটা নিয়ে আঙুলে আলতো করে একটা চুমু খেয়ে বলল, তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছি। মনের খুশীটা চাপতে পারছি না। আনন্দটা পায়ের শব্দে ফুটে বেরুচ্ছে। আমার গানের গলা নেই, নয়ত একটা যুঁই ফুলের গড়ে মালা এনে তোমার গলায় পড়িয়ে দিয়ে গান ধরতাম ও মাই হার্ট থ্রব। আই ওয়ান্ট টু স্টিল ইওর স্থইট লিটল হার্ট—ফর এভার—ফর এভার!

তপতী একটু মিষ্টি করে হাসলো। বলল, কবিতা আওড়ালে তো আর পেট ভরবে না। পেটে এদিকে ছুঁচোয় ডন বৈঠক করছে। আগে খেয়ে নাও তারপর কাব্যি কোরো।

তপতী স্নান সেরে একটা তাঁতের শাড়ি পরেছিল ঘরোয়া ভাবে। দু একটা অবাধ্য চুল কপালে এসে পড়েছে। সুন্দর করে টিপ পড়েছে একটা। তাকে অনেকটা দুর্গা প্রতিমার মত লাগছিল। তপতীর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে নরেন বলল, সত্যি তপু! সাধারণ বেশে তোমায় এতখানি অসাধারণ দেখায় কি করে বলতো। পার্টির মাঝে তোমাকে এত মিষ্টি লাগে না কিন্তু।

তপতী জানে তার সবকিছুর মাঝেই নরেন অসাধারণত্ব দেখে বেড়ায়। এটা নিত্য নৈমিত্তিক। তবু তপতী খুশী হয় রোজ নরেনের প্রশংসায়। তপতী জানে নরেনের প্রশংসায় ভালবাসার খাঁটি সোনা ঝিলিক দিচ্ছে। নরেন তার মনের সঙ্গে ভীষণ ভাবে একাত্ম হয়ে গেছে। এ ভালবাসার প্রদীপ মনের ভেতর স্নিগ্ধ আলো জ্বালিয়ে রাখে—আগুণ জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয় না কিছু।

চা খেতে খেতে তপতী বলল, কতদিন আর পরস্ত্রীর প্রশংসা করে দিন কাটাবে। এবার একটা বিয়ে থা করে সংসারী হও।

নরেনের কথা বলার একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে। সেই ভঙ্গীতে বলল, সকালের রোদে ভেজা ব্যালকনির চেয়ারে তোমার মুখোমুখি বসে চা খাচ্ছি। ভেবে দেখ একটি সুস্থ যুবক আর একটি পতি পরায়ণা সুন্দরী পরস্ত্রী। চারদিকে কেউ নেই, মনে মিষ্টি গানের সুর আসছে। কি দারুণ রোমান্টিক পরিবেশ। আর এই সময়ে বিয়ে। হায়রে সুন্দরী নারীরা এমন ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট হয় কেন। পুরো কাবাব মে হাড্ডি। সব মাটি করে দিলে। অবন ঠাকুরের একটা সুন্দর ছবির ওপর পুরো এক দোয়াত কালি উল্টে দিলে তুমি।

তপতী খিল খিল করে হাসতে থাকে। বলে, পাছে আবার ভাবে বিভোর হয়ে তুমি মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেল তাই একটু বাস্তবে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম তোমাকে। তারপর মৃদু ভৎর্সনা করে বলল, একি কিছুই তো খাচ্ছো না তুমি। নিশ্চয় বাড়ি থেকে কিছু খেয়ে এসেছো। কি স্বার্থপর তুমি। আর এদিকে আমি না খেয়ে বসেছিলাম। কি ভালবাসার বহর বখতিয়ার খিলজীর। তপতীর দেওয়া নরেনের আদরের নাম।

নরেনের মনটা কবিত্বে আর ছেলেমানুষিতে ভরা। কথার ফুলঝুরি জ্বললে আর থামতে চায় না।

নরেন বলল—যাই বল বাপু তোমার সঙ্গে পরিচয় না হলে রাধা কেষ্টর প্রেমের ব্যাপারটা বুঝতেও পারতাম না।

—এর মধ্যে আবার রাধা কেষ্টকে পেলে কোথায়? তপতী জিজ্ঞেস করে।

—আরে সেই কথাটাই তো বোঝাতে চাইছি এতক্ষণ। বুঝলে, অবৈধ না হলে প্রেমের তীব্রতা থাকে না। ব্যাপারটা বোঝ। ছেলেমেয়ের দেখা হল—প্রেম হল—বিয়ে হল—ব্যস। সব আবেগ সব অনুভূতি মনের লকারে বন্দী হয়ে গেল চিরদিনের মত। তারপর সেই আহার, নিদ্রা, মৈথুনের রুটিন বাঁধা ছকে জীবনের রূপটাই ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেল। অথচ অন্যদিকে দেখ। পরস্ত্রী। পাবার কোন আশা নেই, এই হারালাম, এই হারালাম আশঙ্কা। মনের গভীরে বিদ্যুতের চমকানি। দিন যত বাড়বে ভালবাসার তীব্রতা তত বাড়বে। কোনদিন আর পুরানো হবে না। দেখা হলেই দেখবে নিত্য নতুন নতুনত্ব মনের ছবিতে নতুন নতুন রং লাগিয়ে যাচ্ছে। একেবারে

আন এণ্ডিং। বুঝলে তপু। রাধা আর কেষ্ট হচ্ছে জগতের সর্ব্বকালের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রেমিক প্রেমিকা। পাওয়াটা সহজ হলে পাওয়ার মূল্যটাই কমে যায়। না পাওয়ার যন্ত্রণা না থাকলে মনের গভীরে প্রেমের মিষ্টি আলো চিরদিন ধরে জ্বলতে পারে না।

নরেনের বলার ভঙ্গীতে তপতী হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। ভ্রূভঙ্গী করে জবাবে বলে, যতই ওকালতী কর—সে গুড়ে বালি। পরকীয়া প্রেমে তোমার কোন সাকসেস নেই।

নরেন একটা সিগারেট ধরাচ্ছিল। তপতী জোর করে সিগারেটটা কেড়ে নিয়ে বলল—তোমাকে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ডাকিনি, ব্রেকফাস্ট খাবার জন্যে ডেকেছি প্লেটের খাবার একটা পরে থাকলে খোলা দরজা দিয়ে বার করে দোব।

নরেন জবাব না দিয়ে শান্ত ছেলের মত খেতে লাগল। তপতী বলল—রাত্রে ডিনার খাওয়াবে তুমি ঠিক আছে। দিনে এখানে খাবে। চিংড়ি মাছের মালাইকারী করব।

উল্লাসে নরেন হাততালি দিয়ে ওঠে, বলল—ইউ আর গ্রেট তপু। একেবারে অন্তর্যামী তুমি। সকালে আমি তোমাকে ঠিক ওটাই বলব ভাবছিলাম। দারুণ কর তুমি মালাইকারী। অলক বাবুর ভাগ্যকে আমার হিংসে করছে।

তপতী জিজ্ঞেস করে—কিন্তু হঠাৎ রাত্রের ডিনার কি খুশীতে বললে না তো।

—বলছিনা খাওয়ানোর পরে জানাব।

তপতী গম্ভীর হয়ে বলল, না বললে খাবই না তোমার সঙ্গে।

—অমনি মেয়ের রাগ হয়ে গেল, আচ্ছা বাবা বলছি। আজ থেকে ঠিক একত্রিশটা বসন্ত আগে অধম নরেন বহেলের চোখে পৃথিবীর প্রথম আলো এসে পড়েছিল। সেই সামান্য দিনটাকে তোমার সাহচর্যে একটু অসাধারণত্বের টাচ দিতে চাইছি এইআর কি।

আজ নরেনের জন্মদিন—তপতীর মনে ছিল না। একটু লজ্জা পেয়ে তপতী বলল—ছিঃ ছিঃ। আমি তোমার কি রকম বন্ধু দেখেছো তো! বন্ধুর জন্মদিন

খেয়াল রাখিনা। দাঁড়াও রামসিং কে আবার বাজার পাঠাই। রিয়েলি নরেন আই এ্যাম ভেরি ম্যাচ এসেমড।

নরেন ছদ্ম গাম্ভীর্যে জবাব দিল,·অপরাধ করেছো যখন তখন শাস্তি পেতে হবে।

তপতী বলল, ঠিক আছে-যা শাস্তি দেবে মাথা পেতে নোব। যা গান শুনতে চাইবে তাই শোনাব। তোমার পছন্দ মত খোঁপা করব, তাঁতের শাড়ি পরব। আজ যা যা তোমার পছন্দ সব করবো

নরেন গম্ভীর মুখে বলে, ঠিক আছে সুরু কর তবে, প্রথমেই গলায় আঁচল দিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম।

তপতী দুম দুম করে নরেনের পিঠে কিল মেরে বলল, কি আবদার রে জ্যাঠামশায়ের-প্রণাম করবো। তবে প্রণামের বিকল্প হিসেবে কাণদুটো তোমার কষে মুলে দিতে পারি যদি চাও।

— ব্রিচ অব কনট্যাক্ট হয়ে যাচ্ছে। ম্যাডাম তুমি এখুনি বললে না আমার যা যা পছন্দ সব করবে।

হঠাৎ তপতী বলে উঠল, এ মা আমি যে ডিম খেয়ে ফেললাম।

নরেন বিস্ময়ে বলে, কেন তুমি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করলে কবে থেকে।

—দূর ছাই, কেন তুমি আগে জানাও নি আজ তোমার জন্মদিন। তারপর বলল, ডিম খেয়েছি তো কি হয়েছে। চল মন্দির এখন খোলা আছে। তোমার জন্যে পূজো দিয়ে আসি।

নরেন হাসল একটু। তারপর বলল পার্টি, সোসাইটি করলে কি হবে মনের মধ্যে তোমার এখনও প্রচীন সংস্কারটা পুরো মাত্রায় রয়ে গেছে। মন্দিরে যেতে হয় তুমি যাও আমি এখন উঠতে পারব না।

তপতী ধমক দেয় নরেনকে, বলে—কোন কথা শুনতে চাইনা। মন্দিরে তোমার ঢুকতে হবে না। আমি পূজো দোব ভেতরে গিয়ে। তারপর একটু মার্কেটে যাব। তোমার জন্মদিন মনে না রেখে অন্যায় করেছি সেটা একটু কমপেনসেট করতে দেবে না।

পথে যেতে তপতী নরেনকে বলল—একটা কথা বলি তোমাকে নরেন—এবার একটা বিয়ে থা করে সংসারী হও। তাতে আমার ভাল লাগবে। তুমি আমায় ভালবাস জানি—কিন্তু আমার কাছ থেকে তুমি তো কিছুই পাবে না নরেন—কতটুকুই বা আমি তোমায় দিতে পারি। আমার জন্যে নিজের জীবনটাকে নষ্ট কোরো না তুমি—তাতে আমি শান্তি পাব না।

নরেন কোন কথা বলল না—তপতী আবার বলল, আজ আমার মনটা ভাল নেই। কোনদিন বলিনি কাউকে। আমার জীবনের কতকগুলো কথা তোমায় বলতে চাই। মনের বোঝা হাল্কা করতে না পারলে আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাব।

দুপুরে খাবার পর তপতী বলল, খাবার পর একটু শুতে ইচ্ছে করছে। শুয়ে শুয়ে তোমার সঙ্গে গল্প করি।

—বারে তুমি শুয়ে শুয়ে ঘুম লাগাবে আর আমি বসে কড়িকাঠ গুণবো নাকি?

তপতী খাটের ওপর আর একটা বালিশ এনে দিয়ে বলল—কড়িকাঠ গুণতে বলেছি তোমায়। তুমিও শুয়ে পড়। তবে তোমার সিগারেটের আগুনে আমার চাদর পুড়ে গেলে কিনে দিতে হবে কিন্তু।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর নরেন বলল, কি বলবে বলছিলে তুমি।

তপতী নরেনের দিকে ফিরে বলল, কথাগুলো মনে মনে একটু গুছিয়ে নিচ্ছিলাম। আসলে কোথা থেকে সুরু করব ভেবে পাচ্ছি না।

তপতীর মনে কি যে বেদনা থাকতে পারে নরেন ঠিক বুঝতে পারছিল না। সকাল থেকে কথাটা শোনা অবধি নরেন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল শোনার জন্যে। কিছু না শুনেই তপতীর জন্যে মনে মনে সে একটা বেদনা অনুভব করছিল।

—জান নরেন, আমার মনের ভেতর কতকগুলো চাপা ব্যথা রয়েছে যা আমি কাউকেই বলতে পারিনি অথচ সহ্যও করে নিচ্ছি সব। বাইরে থেকে

লোকে হয়ত ভাবে আমার মত সুখী আর কেউ নেই। কিন্তু আমার মনের দুঃখের পাল্লাটা দিনে দিনে ভারী হতে হতে যেটুকু সুখ পেয়েছিলাম তার ওজন অনেক কমিয়ে দিয়েছে।

তপতীর মুখে এ ধরনের কোন কথা নরেন কোনদিন শোনেনি। তাই বলল, ভীষণ দুর্বোধ্য হয়ে যাচ্ছো তুমি তপু। আমি মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

—জীবনটাই তো রহস্যে ভরা নরেন। প্রত্যেক মানুষের মনের ভেতর একটা নিজস্ব জগত থাকে সেখানের সঙ্গী হতে পারে না অন্য কেউ। স্বামী-স্ত্রী পিতা-মাতা, বন্ধু- বান্ধব কেউ তোমার মনের সাথী হতে পারে না সেখানে। অন্দর মহলের দরজাটা খুলে মাঝে মাঝে ভেতরে প্রবেশ করে দেখবে সেখানে নানান বাক্স ভর্তি অভিজ্ঞতা—নানান সুখ দুঃখ, আনন্দ অনুভূতি থরে থরে সাজানো রয়েছে। সেটা তোমার একান্তভাবে নিজের জিনিষ—ভীষণভাবে একার বস্তু। বাক্সের ডালাগুলো খুললে কখনো তোমার চোখে জল আসবে কখনোও বা খুশীর আমেজে মনকে ভরিয়ে দেবে।

নরেন কোন কথা বলে না। নীরবে সিগারেট টানতে থাকে।

তপতী বলে চলে, মধ্যবিত্ত এক গোঁড়া পরিবারে আমার জন্ম হয়েছিল। বিধি নিষেধের নানান বেড়াজালের ভেতরেই অরুণ নামের এক যুবককে ভালবাসলাম আমি। ভালবাসলাম না বলে বরং বলি ভালবাসা হয়ে গেল সব শাসন আর বন্ধনকে উপেক্ষা করে। যদিও জানতাম এ ভালবাসার পরিণতি নেই। তবু আই কুডন' চেক মাইসেলফ। যথারীতি ভালবাসার মানুষকে পেলাম না আমি। আমার বিয়ে হয়ে গেল তোমাদের মিঃ অলক মুখার্জির সঙ্গে। বাড়ি থেকে দেওয়া বিয়ে।

বিয়ের পর মনটাকে তৈরী করে নিলাম। ভাবলাম আমার স্বামী তো কোন দোষ করেননি। আমার প্রেমের ব্যর্থতার জন্যে তাকে যেন কষ্ট না দিই কোনদিন। বুঝলে নরেন বিয়ের পর প্রাণভরে ভালবাসতে লাগলাম স্বামীকে। এত ভালবাসা আর কেউ বেসেছে কিনা জানিনা। অরুণের

কথা চিন্তাও করতাম না কোনদিন। মনে পড়লে জোর করে সরিয়ে দিতাম অরুণের ভাবনা।

স্বামীর সোহাগ, সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য, প্রতিপত্তি সব মিলিয়ে নিজেকে ভীষণ সুখী বলে মনে হতে লাগলো।

কিন্তু জীবনটা যে সহজ নিয়মে চলে না নরেন। কোন অজানা ঈশান কোণে যে ঝড়ের মেঘ লুকিয়ে থাকে মানুষ তা বুঝতে পারে না। বেশ চলছিল বিয়ের দু এক বছর। কোন দুঃখ নেই, কোন সমস্যা নেই। প্রেমমুগ্ধ স্বামী-স্ত্রীর স্বচ্ছল সংসারে অভাব ছিল একটা ছোট কচি মুখের শুধু।

আমার স্বামী অলক মুখার্জি মফঃস্বল শহর থেকে কলতকাতায় এসে জীবনে বড় হবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। যে সমাজে তিনি মিশতে সুরু করলেন সেখানে টাকা আর প্রতিপত্তির মাপকাঠিতে আভিজাত্যের বিচার হয়। সব দেখে শুনে তার মনের চেহারাটাই আস্তে আস্তে পাল্টে যাচ্ছিল। অনেক বড় হবার লোভের মরিচীকা তাকে পাগল করে তুলতে লাগলো। অর্থ আর প্রতিপত্তি ক্রমে তার ধ্যান-জ্ঞানে পরিণত হল। বিপর্যয়ের শুরু তখন থেকেই।

সেই সঙ্গে শনি হয়ে জুটলাম আমি। সুন্দরী যুবতী স্ত্রী। এদেশে স্বাস্থ্যবতী যুবতী হবার যে কি জ্বালা তা তুমি বুঝবে না নরেন। মেয়েদের দেহ নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে লোভী পুরুষের দল। মালহোত্রদের মত লোকের অভাব নেই দেশে। ওদের চোখে মেয়ে মানেই ভোগের সামগ্রী।

নরেন প্রতিবাদ করে বলল—শুধু পুরুষদের দোষ দিয়ে লাভ কি বল। মেয়েরা সবাই তো আর ধোয়া তুলসী পাতা নয়। নিজের চোখেই তো দেখছি!

তপতী বলল—তুমি ঠিক বলেছো। কিছু মেয়ে আছে যারা দেহ সম্পদকে সম্বল করে খ্যাতি আর প্রতিপত্তির সিংহ দুয়ার ভেদ করে ঐশ্বর্য্যের জগতে প্রবেশ করতে চায়। ভাবে তারা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। পাঁকাল মাছের মত কাদা ভেদ

করে ছিটকে গিয়ে আবার নিজের জলাশয়ে ফিরে আসতে পারবে। মেয়েরা নিজেদের চালাক ভাবলেও আসলে তো বোকাই—তাই বুঝতে যখন পারে তখন অবস্থার চাপে হয় ফেরার আর অবস্থা থাকে না—নয়ত ফিরতে ইচ্ছে করে না; তাই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মত এটাকে পারমিসিভনেস বলে মনকে চোখ ঠারতে চায়।

জান নরেন, প্রিটেনশান আমার ভাল লাগে না। (একজন বিবাহিতা মহিলা বা পুরুষ একজন ছেলে বা মেয়েকে ভালবাসতে পারে। সমাজের চোখে তা অন্যায় হলেও মনের চোখে সেটা পাপ হওয়া উচিত নয়। মনের ওপর তো কারুর জোর থাকে না। কিন্তু ভালবাসার ভান করে ফয়দা ওঠানো আমি ঘৃণা করি। আই সিম্পলি হেট দেম।)

কি দুর্ভাগ্য দেখ আমার—সব বুঝেও আমার স্বামী বড় হবার স্বপ্নে মশগুল হয়ে নিজের হাতে ধরে আমাকে এই সমাজের নরকে বিকিয়ে যেতে এগিয়ে দিলেন। আমাকে টোপ ফেলে নিজের আখের গোছাতে চাইলেন।

নরেন কষ্ট পেল মনে। তবু বলল—তোমার কোথাও বোঝার ভুল হয় নি তো তপতী।

—ভুল—ফুঁসে ওঠে তপতী। ভুল আমার হয় না একথা বলব না তবে এক্ষেত্রে অন্ততঃ বুঝতে ভুল হয় নি আমার। বিয়ের বছর খানেকের মধ্যে অনেক উঁচুতে ওঠার স্বপ্ন সফল করবার জন্যে আমার স্বামীর মনের আসল চেহারাটা যখন দেখতে পেলাম তখন খুব কষ্ট লেগেছিল মনে। আমি যে একেবারে নির্দোষ একথাও বলব না। আমি তো মেয়ে—লোভী তো একটু হবই। প্রাচুর্যের স্বপ্ন যে আমিও দেখতে ভালবাসতাম না তা নয় তবে তার চেহারাটা ছিল আলাদা।

তবু বড় হবার যে স্বপ্নটা অলক দেখেছিল তার সবটুকু মন থেকে না চাইলেও অবচেতন মনে আমার হয়ত তার প্রতি কিছুটা লোভ জেগেছিল একটা সময়ে। স্বার্থ হয়ত দেখেছিলাম আমিও—কিন্তু সর্ব্বস্ব খুইয়ে জোয়ারের স্রোতে ভেসে যাওয়ার বিরুদ্ধে ছিলাম আমি। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় অলকের লোভের চেহারাটা যখন দেখতে পেলাম তখন থেকেই আমার শক্ত হওয়া উচিত ছিল।

ভুল করেছি জীবনে—জানিনা কতখানি খেসারত আমাকে তার জন্যে দিতে হবে।

যখন বুঝলাম তখন বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু দেখলাম কোন লাভ নেই। অলক লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছে। আমার অবস্থা তখন শাঁখের করাতের মত। যে দিকেই যেতে চাই বেশ বুঝতে পারছিলাম যে ঘর আমার ভাঙবেই।

মনের সব বেদনাকে চেপে ধীরে ধীরে মনকে অনেক প্রবোধ দিয়ে স্বামীর হাত ধরে যাত্রা শুরু করলাম তোমাদের পারমিসিভ সোসাইটির শিকার হবার জন্যে। মালহোত্র অলকের মনে কি মন্ত্র দিয়েছিল জানিনা তবে সে চাইতো তার বড় হবার সাধনায় আমি যেন সর্বতোভাবে সাহায্য করি। স্ত্রী বলে কথাগুলোকে ঠিক মুখে বলত না তবে আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিত।

তপতী একটু থেমে আবার গভীর বেদনার স্বরে বলতে লাগল, প্রথম প্রথম আমার বিবেকে বাধত, এখনও বাধে। আমি তো এ সমাজের মেয়ে নই। গোঁড়া ঘরে জন্মেছি। জীবনের অর্ধেকটার সঙ্গে প্রাচীন একটা সংস্কার মিলে মিশে রয়েছে। তাই পার্টিতে মদ খেয়ে মনের ভেতর কান্না আসে। অর্ধনগ্ন পোষাকে পার্টি থেকে ফিরে গায়ে জ্বালা করে। মত্ত পরপুরুষের স্পর্শ লাগা দেহে জল ঢেলে ঢেলে পরিষ্কার করি বাড়ি ফিরে এসে। কিন্তু হলে কি হবে নরেন, লোভ আর মোহের শিকার হয়ে আস্তে আস্তে আমি ভদ্রবেশী বেশ্যা হয়ে গেলাম। সমাজের নোংরা নর্দমার পাঁকে সারা শরীরটা ডুবিয়ে নিজের সংসার দুর্গন্ধে ভরিয়ে দিলাম আমি। সবচেয়ে বড় কথা আমার স্বামী হাত ধরে আমাকে এগিয়ে দিলেন সেই পথে।

টপ টপ করে তপতীর চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে।

তপতী থামে না। ধরা গলায় বলতে থাকে—আমার হয়েছে এই জ্বালা। না পারি অতীতের সংস্কারটা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে না পারছি এ সমাজের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যেতে। আমার সব হারিয়ে গেছে নরেন, তুমি বলে দাও আমি কি নিয়ে বাঁচবো, কি করে বাঁচবো।

তপতী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। নরেন উঠে এসে পরম স্নেহে তপতীর চোখদুটো মুছিয়ে দেয়। হাত রাখে তপতীর মাথায়। বেদনারুদ্ধকণ্ঠে হৃদয়ের সবটুকু অনুভূতি দিয়ে কোমল স্বরে বলল—তপু—এ জীবন তুমি ছেড়ে দাও। তুমি এ্যাডজাস্ট করতে পারবে না এ জীবনের সঙ্গে। মালহোত্র বড় সাঙ্ঘাতিক লোক—তার হাত থেকে তুমি বাঁচতে পারবে না। সম্ভব হলে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করো।

তপতী বলল, এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই আমার। মালহোত্রকে চটাবার সাহস এবং ইচ্ছে কোনটাই অলকের নেই। তার চোখে এখন অনেক বড় হবার স্বপ্ন। আমি দেখতে চাই, আমার দেহের আত্মাহুতিতে অলকের শান্তি আসে কিনা। জীবনের শেষ পরীক্ষায় যদি হেরে যাই তবেই ভাববো অন্য কথা। আমি শেষ দেখে যেতে চাই নরেন। এখনও মনে হয় হয়ত জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে পারব আমি, সেই আশাতেই চুপ করে আছি।

নরেনের কাঁধে মুখ রেখে তপতী হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে।

নরেন বলল—এতে তোমার কি লাভ হবে জানিনা—আমার খালি মনে হচ্ছে স্বামীর ওপর অভিমান করে তুমি নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনছো।

তপতী বলল—বেদনার জ্বালায় আমি অন্ধ হয়ে গেছি নরেন। স্ত্রীর মর্যাদার চেয়ে জীবনের উন্নতিটাই বড় হোল অলকের কাছে, এ লজ্জা আমি ঢাকবো কোথায়। এ যে আমার কত বড় অপমান তা তুমি বুঝতে পারবে না। সভ্যতার অভিশাপে আমি জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছি নরেন—আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি।

সুগভীর বেদনায় নরেনের মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কথা বলতে পারে না নরেন। সস্নেহে তপতীর পিঠে হাত বোলাতে থাকে। তপতীর জীবনের এদিকটা তার জানা ছিল না। সুখের চেহারাটা এক একজনের কাছে এক এক রকম। যে যেমন ভাবে দেখে। কিন্তু সর্বাঙ্গে ক্ষত নিয়ে একটা অসহায় মানুষ আবার কি ভাবে বেঁচে উঠতে পারবে ভেবে পায় না নরেন।

কিছুক্ষণ বাদে তপতী বলল, আমি কত বড় ভাগ্যহীনা মেয়ে দেখ নরেন।

আমার মত একটা নগণ্য মেয়েকে ভালবেসে একজন ঘর ছেড়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার জীবনের সুখ শান্তি ঘর সবকিছু আমার জন্যে শেষ হয়ে গেল। প্রাণ দিয়ে ভালবাসলাম যে স্বামীকে, অর্থ আর প্রতিপত্তির মোহে সে আমাকে নরকের পণ্যে পরিণত করতে চাইছে। জীবনে ভালবাসার কি কোন দাম নেই নরেন—অর্থই কি সব?

মনের এই মানসিক বিপর্যয়ের সময় আলাপ হলো তোমার সঙ্গে। আমার মনের ফুরিয়ে যাওয়া হাসি আবার ফিরিয়ে এনে দিলে তুমি। প্রাণ দিয়ে ভালবাসলে আমায়। অথচ তোমাকে তো কিছুই দিতে পারব না আমি। দেহটাইতো জীবনের সব নয়। আমি বিষকন্যা, নরেন—আমার নিশ্বাসের বিষে তোমাকে আর জ্বলে পুড়ে যেতে দেবনা আমি। আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর তুমি, বিয়ে করবে—আমাকে ভুলতে চেষ্টা করবে।

তপতীর কাঁধে হাত রেখে নরেন বলল—যদি তুমি শান্তি পাও, তুমি যদি সুখী হও তবে বিয়ে করব আমি। তোমার সুখের জন্যে আমি সব কিছু করতে রাজী আছি তপু। তোমার চোখের জল আমি সহ্য করতে পারব না। অলকবাবু আসুন—আমি তাঁকে আবার বোঝাবার চেষ্টা করব।

তপতীর চোখের জল বাধা মানেনা। আবেগে নরেনের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে তপতী বলল, তুমি আমায় এত ভালবাসলে কেন নরেন? ভালবাসা যে আমার সহ্য হয় না। আমার জীবনের ট্রাজেডী দেখ, যে দুজন আমাকে প্রাণভরে ভালবাসলো তাদের আমি কিছুই দিতে পারলাম না—আর যাকে বিয়ে করে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসলাম—সে আমার ভালবাসাকে পায়ে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে দিল।

নরেনের চোখে জল চিক চিক করছিল। তপতীকে তবু সান্ত্বনা দিয়ে বলল—তুমি ভেবো না তপু। দেখবে আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর পরিবেশটা হাল্কা করে দেবার জন্যে বলল—আমার কিন্তু ভীষণ খিদে পেয়েছে। এক কাপ চা খাওয়াও অন্তত।

তপতীর সম্বিত ফিরে এল। জিব কেটে বলল—দেখেছো আমি খালি নিজের দুঃখের পাঁচালীই পড়ে গেলাম। ছিঃ, ছিঃ! তোমার জন্মদিনের মুডটাই নষ্ট

করে দিলাম। আজ সকাল থেকে মনটা খারাপ ছিল। তাই নিজেকে আর ধরে রাখতে পারিনি, চল-কিছু খেয়ে সিনেমা যাই।

তপতী নরেনকে একটু বসতে বলে রান্না ঘরে গিয়ে নিজের হাতে নরেনের জন্যে খাবার তৈরী করতে লাগলো।

(৮)

অলক দিল্লী থেকে ফিরে সুসংবাদ শোনালো তপতীকে। তপতীর কোন ভাবান্তর ঘটল না। শুধু বলল—তোমাকে বারন করতে যাওয়া বৃথা। তাই কিছু বলব না। তবে তোমার পদোন্নতির জন্যে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

—আর মালহোত্র তোমাকে যে পি, আর, ওর চাকরীটা দিলেন। জান উনি কথা দিয়েছেন যে বছরে আমাদের অন্তত একবার করে বিদেশে ঘুরে আসবার ব্যবস্থা করে দেবেন।

চা ঢালতে ঢালতে তপতী বলল—তোমায় না হয় উঁচু পোস্ট দিল কোম্পানীতে—কিন্তু আমার মত সামান্য একজন অনভিজ্ঞ বি এ পাশ মেয়েকে দু হাজার টাকার পি, আর, ও-র চাকরী মালহোত্র কেন দিল তা তুমি বুঝতে পারছো না?

অলক চটে গেল। রেগে গিয়ে বলল—ঐ নরেনই তোমার মাথাটা খেয়েছে। মালহোত্র সম্পর্কে নানান উল্টোপাল্টা কথা তার কাছ থেকে শুনে নিশ্চয় তোমার এ ধারণা হয়েছে। আমারও আগে অবশ্য তার সম্পর্কে একটা অন্য ধারণা ছিল। কিন্তু এবার দিল্লী গিয়ে মালহোত্রকে নতুন করে চিনতে পারলাম। সে যে কতবড় মহানুভব ব্যক্তি তা তুমি তার সঙ্গে না মিশলে জানতে পারবে না। তবে এও বলি তোমায় যারা অনেক দেয়—তাদের সামান্য কিছু রেসিপ্রোকেট করাও মানুষের কর্তব্য।

তপতী একটু হাসলো মাত্র। আস্তে আস্তে বলল—মালহোত্রর চাওয়ার চেহারাটা ভেবে দেখেছো কোনদিন। কি করব বল গাঁয়ের মেয়ে আমি। লোক চিনতে ভুল করি। তবে একটা কথা স্পষ্ট করে বলি তোমায় যে তোমার উন্নতির পথে মন না চাইলেও যা বলেছো সবই তো করেছি—আর কতদূর

নীচে নামাতে চাও তুমি আমায়। পরিষ্কার করে বলার সাহস নেই কেন তোমার যে স্ত্রী তোমার কাছে সওদার বস্তু মাত্র। মালহোত্রর কাছে বাঁধা রেখে জীবনের বাজী জিততে চাইছো তুমি।

অলক রেগে গিয়ে বলল—পড়ে ছিলে তো একটা মফঃস্বল শহরে। জীবনের কতটুকুই বা দেখেছো। গাঁয়ে থেকে থেকে তোমার মনটাই নোংরা হয়ে গেছে। উদারতা, টলারেন্স তোমার কাছ থেকে আশা করাটাই তো অন্যায়। আমি তোমাকে বাঁধা রাখতে চাই এ ধারণা তোমার হল কি করে। সোসাইটির তুমি কিছুই জান না—বোঝও না কিছু। আজকের পারমিসিভ সোসাইটিতে সামান্য দেহের সংস্কার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তোমার দেখার চোখ নেই বলেই তুমি এসব নোংরা কথাগুলো ভাবতে পারছো। তোমার মনটা যে আজকাল এত নিচে নেমে গেছে ভাবতে পারিনি।

তপতী রাগ করলো না। অলকের মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে শুধু বলল—দিল্লী থেকে ব্রেন ওয়াশ তা হলে ভালই হয়েছে বল। থাক আমার মত নোংরা মনের স্ত্রী নিয়ে যাতে তোমায় বিব্রত হতে না হয় তার জন্যে চেষ্টা করব। যে স্বামী স্ত্রীর মর্যাদা রাখে না—তার আবার ঠুনকো মূল্যবোধ—আত্মসম্মান রেখে লাভ কি? তোমাকে সুখী করবার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। জীবন দিয়ে চেষ্টা করব, দেখি তুমি আমায় কত নিচে নামাতে চাও।

অলক বুঝেছিল মালহোত্রকে হাতে না রাখলে তার জীবনের একটা মস্তবড় চান্স হাতছাড়া হয়ে যাবে। এ স্বর্ণ সুযোগ সে ছাড়তে রাজী নয়। অথচ তপতী চটে গেলেও কোন লাভ হবে না। তাই তপতীকে শান্ত করার জন্যে বলল, তপু—তুমি জান হাউ মাচ আই লাভ ইউ। তুমি শুধু শুধু আমাকে ভুল বুঝছো কেন? এতে তো আমাদের লাভ নেই। তোমার আমার দুজনের টাকায় আমরা কতবড় হতে পারব। ভেবে দেখ ভবিষ্যতে ছেলেপুলে হলে তাদেরও তো ভাল করে মানুষ করতে হবে। আমাদের ভেতর আণ্ডারষ্টাণ্ডিং বজায় থাকলেই দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। উই উইল বি হ্যাপী এগেন।

তপতী কোন জবাব দিল না। অলক তপতীকে খুশী করার জন্যে আবার বলল, চল মেট্রোতে একটা ভাল ছবি হচ্ছে দেখে আসি দুজনে। তোমার মনটা ভাল লাগবে। তপতী না বলল না।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে শুয়ে আসল কথাটা এবার অলক তপতীকে বলল, জান তপু। মালহোত্র কাল আমাদের দুজনকে ওনার বাড়ি ডিনারের নিমন্ত্রন করেছেন। তুমি যাবে তো!

তপতী বোধহয় তৈরীই হয়েছিল। তাই বলল, আমি এতক্ষণ ধরে তো সেটাই ভাবছিলাম। এতবড় একটা অফার দেবার পর মালহোত্র কেন সেলিব্রেট করছে না। তারপর ব্যঙ্গের সুরে বলল, তোমার প্রমোশন আমার চাকরী। এতবড় মহানুভব ব্যক্তির বাড়ি যাব না। তুমি দেখ কাল আমি সব থেকে বেশী সেজে গুজে যাব। কাল আমার কত আনন্দের দিন। তুমি ঠিকই বলেছিলে যারা অনেক দেয় তাদের কিছু রেসিপ্রোকেট না করাটা অন্যায়।

তপতী এত সহজে রাজী হবে অলক ভাবতে পারেনি। তপতীর চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল, আই এ্যম গ্লাড যে তুমি নিমন্ত্রন একসেপ্ট করলে। তপতীকে আদর করতে গিয়ে অলক দেখলো তপতীর চোখে জল। জিজ্ঞেস করল, একি তুমি কাঁদছো নাকি?

তপতী বলল, কাঁদবো কেন? এতো আনন্দাশ্রু। সুখের আবেশে চোখে জল এসে গেছে। কাল আমার কত আনন্দের দিন, কত সুখের দিন। আমি কখনও কাঁদতে পারি।

অলক কোন কথা বলল না। পাছে আবার তপতী বেঁকে বসে এই ভয়ে অলক আর কথা না বাড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

(৯)

সকালবেলা উঠেই অলক তপতীকে বলল—তপু আজ আমি নতুন পোস্ট এ যোগ দিচ্ছি—পার্সোনাল ম্যানেজারের আগের ঘরটাকে আরো ভালো করে সাজিয়েছেন মিঃ মালহোত্র। আর আজ তুমিও আমার সঙ্গে অফিসে যাবে।

তপতী বললে—কেন—তোমার নতুন ঘর আর ঐশ্বর্য্য দেখবার জন্যে নাকি?

খুশী মনে অলক জবাব দিল—বারে—আমার জন্তে কেন। আজ থেকে

তুমিও তো পি, আর, ও-র পোস্টে কাজে লাগছো। তপতীর দিকে চেয়ে অলক আবার বলল—আজ তোমার ফরম্যাল জয়েনিং। মিঃ মালহোত্র নিজেই তোমাকে কাজকর্ম বুঝিয়ে দেবেন আর অফিসের সবাকার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। ফ্রম টু ডে অনওয়ার্ড ইউ আর নট অনলি মিসেস তপতী মুখার্জী—বাট পি, আর, ও অফ এ রেপিউটেড কোম্পানী।

তপতীর কেমন ভয় ভয় করছিল। একটা অজানা আশঙ্কার মেঘ মনের ভেতর ধীরে ধীরে এসে জমা হচ্ছিল। তার কেবল মনে হচ্ছিল সে একটা শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যে পথ ভুলে একাকী দিশেহারা হয়ে আসন্ন বিপদের মুখে এগিয়ে চলেছে। তাই অলককে বলল—আজ বুধবার—এ সপ্তাহের বাকী কটা দিন কাটিয়ে সোমবার থেকে গেলে চলত না। মনে মনে এ কটা দিন নিজেকে একটু তৈরী করে নিতাম।

অলক বলল—দূর পাগল। তৈরী হবার কি আছে। শাস্ত্রে আছে পড়নি শুভস্য শীঘ্রম। তুমি তো আর অচেনা কোন জায়গায় চাকরী করতে যাচ্ছো না। আমাদের অফিসের সবাই তো তোমার চেনা। নাও-নাও তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। আমি ছাড়া তোমার বন্ধু নরেনকেও তো পাবে ওখানে—ভয় কি তোমার।

তপতী আর না করতে পারল না। খাওয়া দাওয়া সেরে গাড়ীতে অলকের সঙ্গে অফিসের পথে যাত্রা করল।

অফিসে এসে নামতেই মিঃ মালহোত্র এসে অভিনন্দন জানালেন তাঁর কোম্পানীর নতুন পি, আর, ও ও নতুন পার্সোন্যাল ম্যানেজারকে। অফিসের অনান্যরাও এসে অভিনন্দন জানালেন। মিঃ মালহোত্রের ঘরে টি ব্রেকের পর পারস্পরিক পরিচয় পর্বের ফরমালিটি সেরে মিঃ মালহোত্র বললেন—অলক তুমি তোমার ঘরে গিয়ে বোস। আমি নিজে গিয়ে পি আর ডিপার্টমেন্টে তপতীকে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে ওর ঘরে বসিয়ে দিয়ে আসছি।

তপতী আজ খুব সাদাসিদে একটা তাঁতের শাড়ী পরে এসেছে। সাধারণ পোষাকে তাকে আজ সত্যিই খুব অসাধারণ লাগছিল।

সুন্দর করে সাজানো এয়ার কণ্ডিশানড একটা ঘরের সুইং ডোর ঠেলে মিঃ মালহোত্র তপতীকে নিয়ে ঢুকলেন। বাইরে সুদৃশ্য নেম প্লেটে তপতীর নাম জ্বল জ্বল করে শোভা পাচ্ছে। চেয়ারটা দেখিয়ে মিঃ মালহোত্র নাটকীয় ভঙ্গীতে ফরাসী কায়দায় একটু মাথাটা ঝুঁকিয়ে তপতীকে বললেন – মাই ডিয়ার পি, আর, ও—দেয়ার ইজ ইওর কোজি চেয়ার ওয়েটিং এ্যাংশাসলি টু রিসিভ ইউ। সিট দেয়ার কমফরটেবলি মাই সুইট লেডী।

তপতী ধন্যবাদ জানিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসল। মিঃ মালহোত্র পি, আর ডিপার্টমেণ্টের সকলকে ডেকে তপতীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। তারপর তপতীকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন কাজের ধরনটা।

অফিসে কাজ করবার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা তপতীর ছিল না। তাই সংকোচে প্রশ্ন করল—মিঃ মালহোত্র শুধু শুধু আপনি আমাকে এখানে টেনে আনলেন। অফিসের কাজকর্ম আমি তো কিছুই বুঝি না। আপনাদের ফার্মেরই ক্ষতি হবে বরং আমার মত একজন অনভিজ্ঞ লোককে নিয়ে।

মালহোত্র হাসলেন। বললেন—তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি তো রয়েছি। কোন অসুবিধা হলে সোজা আমার কাছে চলে আসবে। আমি তোমাকে সব কাজ শিখিয়ে দোবো। তুমি দেখো তোমাকে আমি আস্তে আস্তে অনেক বড় করে তুলবো। পি, আর ওয়ার্ল্ডে মিসেস তপতী মুখার্জী একটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেঁচে থাকবে। আই এ্যাম অলওয়েজ বাই ইউর সাইড।

তপতী কোন কথা বলল না। মালহোত্র আবার বললেন—জীবনকে জান—জগতকে দেখতে শেখো। কতকগুলো ওল্ড আইডিয়া নিয়ে বসে থাকলে জীবনে সাইন করতে পারবে না। তুমি জান কিনা জানিনা তবে তোমাকে বলছি যে আমি চাইলে মানুষের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিতে পারি। বাট ইউ মাস্ট ওবে মি। যে ভাবে বলব সে ভাবে চলবে দেখবে কোন বাধাই আর তোমার কাছে বাধা বলে মনে হবে না।

মিঃ মালহোত্রের বলার স্বরে তপতীর বুকটা কেঁপে উঠলো। তপতীর মনে হল সে এবার যে গভীর জালে আটকে পড়ল তা থেকে ছিঁড়ে হয়ত আর কোনদিন বেরিয়ে যেতে পারবে না। তপতীর মনের ভেতর মনটা খালি

বলছিল—তপতী তুমি মস্ত বড় একটা ভুল করলে। চাকরীটা নেওয়া ঠিক হল না তোমার। তপতীর হঠাৎ খুব কান্না পেল। তার নিজের ওপরেই রাগ হতে লাগল। কেন সে ভালভাবে না ভেবেচিন্তে চাকরীতে জয়েন করতে গেল।

তপতীকে চুপ করে থাকতে দেখে মালহোত্র ভাবলেন—ওষুধ ধরেছে। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের একটা ছবি মেয়েদের সামনে তুলে ধরে এমনি ভাবেই তো তিনি কত শক্ত শক্ত মনের মেয়েকে ঘায়েল করেছেন ধীরে ধীরে। তপতীও তার থেকে ব্যতিক্রম হবে না। শিকার ধীরে ধীরে তাঁর হাতের মধ্যে চলে এসেছে ভেবে মনে মনে খুশী হলেন মিঃ মালহোত্র। চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন—তপতী তুমি কাজ স্বরু কর আজ থেকে। আমার একটা মিটিং আছে—বাইরে যেতে হবে। অলক নিশ্চয় তোমাকে বলেছে যে তোমরা আমার বাড়িতে আজ রাত্রে খেতে আসছো। তখন কথা হবে। উইশ ইউ অল দি বেস্ট।

মালহোত্র চলে যেতেই নরেন এসে ঘরে ঢুকলো। চারিপাশটা ভাল করে দেখে সামনের চেয়ারে বসে বলল—কনগ্রাচুলেশন। পি, আর, ও মেমসাহেব। দারুণ ঘরটা সাজিয়েছে মালহোত্র। তা তোমার মত সুন্দরী মহিলার জন্যে এ ধরনের অফিস ছাড়া মানায় না। যাই বল বাপু—মালহোত্রের টেস্ট আছে বলতে হবে।

নরেনকে থামিয়ে তপতী বলল—বুঝতে পারছি না কাজটা ভাল হল, না খারাপ হল!

নরেন বিস্ময়ে প্রশ্ন করল—মানে—চাকরী করবে তার আর ভাল খারাপের কি আছে।

অসহিষ্ণু হয়ে তপতী বলল—এই বুদ্ধির জন্যেই তো তুমি কোম্পানীতে বড় হতে পারছো না। মালহোত্রের ব্যাপার স্যাপার সবই তো তুমি জান। আমার কেবল মনে হচ্ছে নরেন—আমি হেরে যাচ্ছি। যত দূরে সরে যেতে চাইছি ততই মালহোত্রের নাগালের ভেতর আরো বেশী করে এসে জড়িয়ে পড়ছি। শেষটায় কি আছে কে জানে। লেট মি সি।

ব্যাপারটা যে ভাল হল না নরেনও তা বুঝতে পেরেছিল। তবু তপতীকে

সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলল—দূর চাকরীতে জয়েন করেই ফেলেছো যখন—তখন আর কি হবে। তবে একটু সাবধানে থেকো এই আর কি।

—জান আজ মালহোত্র রাতে আমাদের ডিনারের নেমন্তন্ন করেছেন। সেলিব্রেট করবেন বলে। ওটাতেই আমি ভয় পাচ্ছি।

নরেন বলল—আরে বাবা অলোকবাবুও তো যাচ্ছেন তোমার সঙ্গে। অত ভয়ের কি আছে। তারপর পরিবেশটা হাল্কা করে দেবার জন্যে বলল—আমার ভাগ্যটা দেখ—এবার থেকে ঘরে অফিসে সারাদিন তোমার পাশে ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়াতে পারব।

তপতী হেসে ফেলল। বলল—সত্যি তুমি কত অল্পেতে সন্তুষ্ট। সবাই যদি তোমার মত হত নরেন তবে জগতের চেহারাটাই পাল্টে যেত।

নরেন বলল—অতই যদি—তাহলে এক কাপ কফি খাওয়াও অন্ততঃ। তারপর তপতীর দিকে তাকিয়ে বলল—তোমাকে কিন্তু দারুণ দেখাচ্ছে আজ। ইচ্ছে করছে মালহোত্রের মত তোমাকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খাই।

তপতী ছদ্ম ভর্ৎসনা করে বলল—শখ কত বাবুর। একটা চাঁটি লাগাব। ফাজলামি করছো এটা অফিস মনে নেই।

কান দুটো ধরে নরেন বলল—সরি ম্যাডাম ভুল হয়ে গেছে। এটা যে অফিস মনে ছিল না। আসলে কি জান তোমাকে দেখলেই আমার সব উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। ঠিক আছে নতুন চাকরীতে জয়েন করলে—মনে থাকে যেন আমার খাওয়া আর সিনেমা পাওনা রইল।

তপতী হাসতে হাসতে বলল—বাবুর লোভ দেখছি বেড়েই চলেছে দিন দিন। তপতী আরো কি বলতে যাচ্ছিল। পি, আর ডিপার্টমেন্টের একজন ফাইল নিয়ে তপতীর ঘরে ঢুকলো।

নরেন উঠে বলল—তোমরা কাজ কর—এখন আমি উঠি। কফি পরে এসে খেয়ে যাব।

তপতী আজ আগেই বাড়ি ফিরে এসেছিল। প্রথম দিন বলে। সন্ধ্যায় অলক হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল—তপু এদিকে একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। তুমি তো জান যে ইংলণ্ড থেকে দুজন কনসালট্যান্ট এসেছেন। কাল সকালেই তাঁরা চলে যাবেন। আজ সন্ধেটা হোটেলে তাদের এনটারটেন করতে হবে। মিঃ রাঘবন অসুস্থ। তাই মিঃ মালহোত্র আমাকেই বললেন। গাড়ি রেখে গেলাম। তুমি আগে মিঃ মালহোত্রের বাড়ি চলে যাও। আমি কাজ মিটলেই চলে যাব।

ঠাণ্ডা গলায় তপতী জবাব দিল, জানি মালহোত্র আমাকে ফোন করেছিল। সব জেনেই আমি তৈরী হয়েছি। আমাকে কিছুক্ষণ একলা না পেলে মালহোত্র খুশী হবেন কেন?

তপতীকে আজ এরকম শান্ত মেয়ের মত ব্যবহার করতে দেখে অলক বিস্মিত হল। পাছে আবার হঠাৎ ফোঁস করে ওঠে এই ভয়ে আর কথা বাড়াল না অলক। যাবার সময় শুধু বলল, গাড়িটা রেখে গেলাম। যখন তোমার মনে হবে তখন যেও।

তপতী ঠিক সাতটার সময় মালহোত্রর বাড়ি গিয়ে পৌছাল। মালহোত্র অপেক্ষা করেছিলেন। গেট থেকে তপতীকে ঘরে নিয়ে এলেন। কাছে আসতেই তপতী বুঝেছিল যে মালহোত্র আজ বিকেল থেকেই সুরু করেছে।

তপতীর দিকে চেয়ে মালহোত্র বললেন, অপূর্ব্ব লাগছে তোমাকে আজ। এই না হলে আর পি, আর, ও। আমি বলছি তপতী তুমি লাইফে খুব সাকসেসফুল হবে।

তপতী জবাব দিল, আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গদগদ হয়ে মালহোত্র বললেন, ধন্যবাদের কি আছে তপতী। আই লাইক ইউ। তোমার ভাল করা আমার একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে। এদিকে দেখনা বিদেশী কনসালটান্টদের জন্যে অলক আজ ডিনারে আসতে পারবে না। তোমার হয়ত খারাপ লাগছে। কিন্তু আমি তো তোমার অচেনা নই। আমার বাড়িকে নিজের মত মনে কর। ডোণ্ট ফিল শাই মাই গার্ল।

যে সন্দেহটা তপতী আগেই করেছিল তা পরিষ্কার হলো। বুঝলো এটা পূর্বপরিকল্পিত ব্যাপার। কিছু বলল না মুখে।

মালহোত্র পাত্রে পানীয় নিয়ে তপতীর হাতে দিয়ে বললেন—ফর দি হ্যাপিনেস এণ্ড সাকসেস অফ মিসেস তপতী মুখার্জি। গ্লাসে গ্লাস ঠুকে চিয়ার্স করলেন মালহোত্র। বললেন, তোমার অনারে আজ এই স্পেশাল ককটেল বানিয়েছি। ইউ ইউল ফিল কমফোর্টেবল।

সোফায় বসে মালহোত্র শুরু করলেন—জান তপতী—সত্যি কথা বলতে কি তোমার জন্যেই আমি নিজের রিস্কে অলককে প্যার্সোন্যাল ম্যানেজারের পোস্টটা দিলাম। আজ বোর্ডের মিটিংএ পাশ করিয়ে নিয়েছি। প্রথম দিন চাকরী কেমন লাগলো। আমি তোমাকেও অনেক—অনেক বড় করে তুলবো তপতী। মন দিয়ে কাজ করে যাও—কোন ভয় নেই।

তপতী আবার ধন্যবাদ জানাল মালহোত্রকে। মদ্য পানের অভ্যেস থাকলেও পরপর ৩টে ককটেল খেয়ে মাথা ঘুরছিল তপতীর। ক্রমে নিজের ওপর জোর হারিয়ে ফেলছিল তপতী।

হঠাৎ মালহোত্র বললেন—অলক আসতে পারবে না জেনেও কেন আজ তোমাকে আসতে বললাম জানো?

আক্রমণটা কোন দিক থেকে আসছে বুঝতে না পেরে তপতী বলল, না তো?

মালহোত্র একটু চুপ করে থেকে বললেন, আসলে তুমি দুঃখ পাবে ভেবে বলিনি এতদিন। জান কিনা জানি না, তবে অলক কিছুদিন যাবৎ আমাদের ছন্দা বিশ্বাসের সঙ্গে খুব মাখামাখি করছে। দিল্লীতে ওই জোর করে ছন্দাকে নিয়ে গিয়েছিলো। বুঝতেই পারছো এ ব্যাপারে যা হয়ে থাকে। শেষে অলক যদি ছন্দার মোহে তোমার মত ভাল মেয়েকে ডাইভোর্স করে তখন তুমি কি করবে? অলককে আমি অনেক বুঝিয়েছিলাম। আই ফিল ফর ইউ তপতী। তোমার মত এমন স্ত্রী থাকতে সে কিনা ছন্দার খপ্পরে গিয়ে পড়ল। জগৎটা খুব ফানি। তাই সবদিক ভেবেই চাকরীটা দিলাম তোমাকে। প্রয়োজনে যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়।

শুনতে শুনতে তপতীর শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। অলকের সব অন্যায় আবদার মুখ বুজে তপতী এতদিন মেনে নিয়েছিল কারণ তপতী জানতো এত প্রলোভনের জগতের মধ্যেও অলক তপতী ছাড়া অন্য কোন মেয়েকে আমল দেয়নি। এটাই ছিল তপতীর জীবনের শেষ সম্বল—শেষ গৌরব। তপতীর বিশ্বাস জন্মেছিল যে অলকের মোহ একদিন ভঙ্গ হবেই আর তখনই যে আবার অলককে তার নিজের জগতে, নিজের সংসারে ফিরিয়ে আনতে পারবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে মহাশান্তির একটা ছবি তপতী মনে মনে ছকে রেখেছিল। মালহোত্র তার সব কিছু গোলমাল করে দিল।

তপতী ভাবলো এটা হয়ত মালহোত্রর নতুন কোন চাল একটা। তাই জোরের সঙ্গে বলে উঠলো, আই ডোণ্ট বিলিভ ইট, মিঃ মালহোত্র। অলক লোভী, অলকের অনেক দোষ আছে জানি—বাট হি ইজ হবনবিং উইথ ছন্দা, এ আমি বিশ্বাস করি না।

—বিশ্বাস কি আমিও করেছিলাম প্রথমে। ছন্দা নিজেই আমায় আজ বলল—অলক যদি তোমায় ডাইভোর্স করে ওকে বিয়ে না করে তবে সে কোর্টে কেস করবে। মালহোত্র শান্ত গলায় জবাব দিলেন।

হাতের গ্লাসটা সজোরে টেবিলে রেখে তপতী জোরের সঙ্গে আবার বলল, এ আমি বিশ্বাস করি না। আই নো অলক—হি কাণ্ট ডু দিস।

ড্রয়ার থেকে একটা ছবির প্যাকেট বের করে মালহোত্র তপতীর হাতে দিয়ে বললেন, খুলে দেখ। ছন্দা তার দাবীর প্রমাণ রেখে দিয়েছে। আমি জোর করাতে দিল। তবে নাকি নেগেটিভ সব আছে ওর কাছে।

তপতী তড়িতাহতের মত দু চারটে ছবি দেখে বিস্ময়ে, ক্ষোভে, বেদনায় হতবাক হয়ে গেল। বাকীগুলো আর না দেখে ছুড়ে ফেলল মাটিতে। অলকের প্রতি তার শেষ সহানুভূতিটুকু—শেষ জোরটুকু নিমেষেই অন্তর্হিত হয়ে গেল। অন্য মেয়ের ব্যাপারে অলকের নির্লোভের কথা ভেবে তপতী এতদিন সব কিছু সহ্য করে যাচ্ছিল। মনে মনে ভাবতো এদিক থেকে অলক তো তাকে সম্মান দিয়েছে। আজ তার শেষ গর্বটুকু তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়লো। অলক তাকে ডাইভোর্স করে ছন্দাকে বিয়ে করবে। তপতী আর কিছু ভাবতে

পারছিল না। এত নেশার মাঝেও অলক যে তাকে সবদিক থেকে শুধু বঞ্চনাই করেছে ভেবে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। মাথার ভেতর আগুন জ্বলছিল তপতীর। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মালহোত্রকে বলল তপতী, পোর মি মোর ড্রিংকস, আই উইল ড্রিঙ্ক অল দি ওয়াইন অফ ইওর হাউস টুডে। ডোণ্ট ষ্টপ মি প্লিজ।

মালহোত্র তো এই চাইছিলেন। বেশ কিছুটা মদ পাত্রে ঢেলে তপতীর হাতে দিয়ে বললেন, তুমি ভেঙে পড়বে না তপতী। করুক না ডাইভোর্স অলক তোমাকে। আমি তোমার কোন অভাব রাখবো না।

নেশায় তপতী সম্বিত হারিয়ে ফেলেছিল। অলকের এই নতুন চেহারাটা জানার পর এত নেশার মধ্যেও তার চোখ দিয়ে জল উপচে পড়ছিল।

মালহোত্র বুঝেছিলেন বাধা দেবার শক্তি আর নেই তপতীর। শিকার তার পুরোপুরি করায়ত্তে। মালহোত্র তপতীকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ডোণ্ট গেট আপসেট মাই সুইট গার্ল। আমি তো রয়েছি তোমার পাশে। তোমাকে রাণী করে রাখবো।

নেশার ঘোরে তপতী খেয়ালই করতে পারল না যে মালহোত্র তাকে জড়িয়ে ধরে লোভী কুকুরের মত তার সারা দেহ চাটতে সুরু করেছে।

তপতী চীৎকার করতে লাগলো—আই উইল কিল ছাট বাসটার্ড। আই উইল সি অলক মুখার্জি। ছন্দা বিশ্বাস—আই স্পিট অন হার আগলি ফেস।

আর বলতে পারল না তপতী। কাঁদতে কাঁদতে নেশার ঘোরে মালহোত্রর কোলেই ঢলে পড়ল।

মালহোত্র পাকা শিকারীর মত উন্মত্ত, অপ্রকৃতিস্থ তপতীর সারা দেহে চুমু খেতে লাগলেন। তারপর আস্তে আস্তে তপতীর শাড়ী, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার, শায়া খুলে দিয়ে বিছানায় ফেলে তপতীর নগ্ন দেহ নিয়ে পাশবিক উল্লাসে মেতে উঠলেন।

নেশা কেটে গিয়ে তপতী যখন চেতনায় ফিরে এল তখন রাত দুটো বেজে গেছে। দেখলো মালহোত্র বিবস্ত্র অবস্থায় তার সম্পূর্ণ নগ্ন দেহটাকে পেঁচিয়ে শুয়ে রয়েছে। তপতীর চোখে আর জল এল না এবার। এ পরিণতির আশঙ্কায়

তপতী প্রথম থেকেই সাবধান হতে চেয়েছিল। কিন্তু ছন্দা-অলকের কাহিনীর আকস্মিকতা তার মনের সব জোর, সব চেতনা সবকিছু গোলমাল করে দিয়েছিল। নেশার ঘোরে কিছু বোঝবার বা বাধা দেবার শক্তি ছিল না তপতীর। মালহোত্রর বাঁধন কাটিয়ে উঠে ধীরে ধীরে জামা কাপড় পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথে গাড়ি ছোটালো তপতী।

তপতীর সারা মুখে, স্তনে, গালে, তলপেটে পশুটার নখের দাগ। সারা শরীরে একটা অদ্ভুত অবসাদ আর বেদনা। মাথাটা ভন ভন করে ঘুরছে। চোখে কিছু ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না তপতী। হাতে জোর নেই—ষ্টিয়ারিং ঘুরে যাচ্ছে। ব্রেকে পা লাগছে না। হঠাৎ সামনে একটা তীব্র আলোর ঝলকানি দেখে চোখ বুজে ফেলল তপতী। ঊর্ধ্বশ্বাসে আসা একটা লরি সামনা সামনি এসে ধাক্কা মারল তার গাড়িতে। তপতী চেতনা হারিয়ে ফেলল।

(১১)

তপতীর যখন চেতনা ফিরলো তখন সে নার্সিং হোমে। শরীরের নিচের অংশে প্লাস্টার লাগানো। হাতে, দেহের নানান অংশে কাটা ছেঁড়ার চিহ্ন। আস্তে আস্তে সব মনে পড়ল তার।

সামনে বসা নার্স তপতীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, কিছু ভাববেন না সব ঠিক হয়ে যাবে। এ্যাকসিডেন্ট সিরিয়াস হলেও আপনি ভাল হয়ে যাবেন তাড়াতাড়ি। একটা অপারেশন করতে হয়েছে। তিনদিন আপনার জ্ঞান ছিল না।

তপতীর দু' চোখে জলের ধারা নেমে এল। মনে হল সে মরল না কেন!

বিকেল তিনটেয় নরেন এল তপতীকে দেখতে। কোন কথা না বলে তপতীর মাথায় হাত বোলাতে লাগল।

তপতী বলল, কথা বলছ না যে! জিজ্ঞেস করছো না কেন অত রাতে মালহোত্রর বাড়ির কাছে আমার এ্যাকসিডেন্ট হল কি করে? কেন আমি একলা ছিলাম গাড়িতে।

নরেন বলল, তপতী ওসব কথা যেতে দাও। তুমি প্রাণে বেঁচেছো সেটাই আমার কাছে বড় কথা। তুমি খুব তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবে।

অলক এল কিছুক্ষণ বাদে। নরেন ওদের দুজনকে একা থাকতে দেবার জন্যে বাইরে চলে গেল সিগারেট খাবার নাম করে।

অলককে দেখে তপতী শুধু বলল, তুমি এত নিচে নেমে গেছো আমার জানা ছিল না। স্বামী হয়ে এত বড় একটা অপমান তুমি আমায় করতে পারলে? স্ত্রীকে ভালবাসতে না পারাটা অন্যায় নয় অলক, কিন্তু ভালবাসার ভান করাটা কোন শিক্ষিত মানুষের উচিত নয়। তুমি আগে কেন আমায় জানালে না। আমাকে দেখতে এসেছো বলে ধন্যবাদ—তবে তোমার ওপর আমার সব বিশ্বাস সব ভালবাসা শেষ হয়ে গেছে। এখন যদি শুনি লরিটাকে তুমিই আমার গাড়িতে ধাক্কা মারতে পাঠিয়েছিলে তাতেও আমি আশ্চর্য হব না। তুমি সব করতে পার।

অলক অপরাধীর মত মুখ করে বলল, তোমার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন—বেশী কথা না বলাই ভাল।

ব্যঙ্গের হাসি হেসে তপতী বলল—ভয় পাচ্ছো! বেশি কথা বললে পাছে সত্যি কথাটা বলে ফেলি। ভয় নেই, তোমার মনের আসল চেহারাটা পাঁচজনের সামনে আমি ফাঁস করে দোব না। ঈশ্বর আছেন তোমার কাজের শাস্তি তিনিই তোমাকে দেবেন। তবে একটা কথা জেনে রাখো নার্সিং হোমের খরচার একটা পয়সাও আমি তোমার কাছ থেকে নিতে পারব না। তোমার পয়সায় আমার ঘেন্না হয়ে গেছে। তোমার স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে আমার মর্যাদায় বাধে।

অলক বলল, আজ আমি যাচ্ছি কাল আসবো আবার।

তপতী বলল, আমায় রোজ দেখতে এসে তুমি আর অপমান কোরো না আমায়। আমি আর তোমার ভণ্ডামী সহ্য করতে পারছি না। আমাকে একলা শান্তিতে থাকতে দাও। তুমি আর আমার সামনে এসো না।

অলক কথা না বাড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল। দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ডাঃ মিত্র বলেছেন তুমি আউট অব ডেঞ্জার। চিকিৎসার

কোন ত্রুটি রাখবো না আমি। তুমি ভাল হয়ে ওঠো। তারপর উই উইল হ্যাভ এনাফ টাইম টু ডিসকাস থিংস।

অলক যাবার পরই মালহোত্র এলো। নরেন আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—হাউ ডু ইউ ফিল নাউ তপতী, মালহোত্র জিজ্ঞেস করলেন। তারপর আবার বললেন, ডোণ্ট ওরি—দরকার হলে চিকিৎসার জন্যে তোমায় আমি ইংল্যাণ্ড পাঠাব। তুমি কিছু চিন্তা কোরো না। আওয়ার কম্পানী উইল বিয়ার অল দি এক্সপেনসেস। তুমি এখনতো শুধু অলকের স্ত্রীই নও কোম্পানীর পি আর ও তো বটে।

তপতী মালহোত্রর মুখের দিকে ভাল করে তাকাল। লোকটার মুখে অনুশোচনা বা অপরাধবোধের কোন চিহ্ন তপতী খুঁজে পেল না। নার্সিং হোমে অহেতুক সিন করতে তপতীর ভাল লাগছিল না। তাছাড়া ভাবলো তপতী মালহোত্র নির্লজ্জ হতে পারে—কিন্তু তার দোষের মাত্রাটা তো অলকের চেয়ে অনেক কম। যে স্বামী স্ত্রীকে বাজারের পণ্যে পরিণত করতে চায়—অন্যের কাছে তার সম্মানের কি মূল্য থাকতে পারে।

তাই তপতী ধীরে ধীরে বলল—মিঃ মালহোত্র আমি খুব ক্লান্ত আজ, প্লিজ ডু নট ডিসটার্ব মি নাউ। আমাকে দয়া করে একটু বিশ্রাম নিতে দিন।

মালহোত্র বললেন—নিশ্চয়! নিশ্চয়! বিশ্রামই তো তোমার দরকার এখন। আজ তাহলে চলি। আমি রোজ এসে তোমার খোঁজ নিয়ে যাবো।

তপতী আর সহ্য করতে পারছিল না। কঠিন স্বরে বলল, মিঃ মালহোত্র আপনার যা পাবার তাতো পেয়েই গেছেন। ডোণ্ট ওয়েস্ট মনি অন মি। আপনার কাছ থেকে নেবার বা দেবার আমার আর কিছু নেই। ইফ ইউ থিংক দ্যাট ফ্রম নাউ অনওয়ার্ডস আই উইল কনটিনিউ টু লিভ এজ ইওর কেপ্ট লাইক আদার্স,—ইউ আর লিভিং ইন দি ফুলস প্যারাডাইস। আই স্পিট অন ইওর পি আর ও'স জব। আপনি কাল থেকে আর আসবেন না এখানে।

মালহোত্র নির্লজ্জ। তপতীর কথা গায়ে মাখলেন না। ভাবলেন মানসিক

ভারসাম্য হারিয়ে উল্টো পাল্টা বকছে। কিংবা হয়ত দর বাড়াচ্ছে। মেয়েদের তার ভাল করে চেনা হয়ে গেছে।

মালহোত্র খেলোয়াড় লোক। বুদ্ধিমানও বটে। তাই অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়ে বললেন—সে তুমি যাই বল তুমি ভাল না হওয়া পর্যন্ত আমাকে এখানে আসতেই হবে। এটা আমার কর্তব্য।

তপতী আর কথা বাড়াল না। মালহোত্র চলে গেলেন।

নরেন তপতীর খাটে এসে বসতেই নরেনের হাত দুটো ধরে তপতী হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো। নরেন শুনেছিল সব। মনে মনে একটা আন্দাজ করেছিল অবশ্য। কোন কথা না বলে নীরবে পরম স্নেহে তপতীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। আজ তপতীর কাঁদার দিন। কাঁদুক একটু তপতী। না কাঁদলে মনের ভার লাঘব হবে না—গুমরে গুমরে হয়ত পাগল হয়ে যাবে তপতী।

কিছুক্ষণ বাদে তপতী বলল---নরেন, তুমি ছাড়া আমার এখনতো আর কেউ নেই। তোমাকে ছাড়া আর কাকে বলব। আমার জন্যে একটা ছোট ঘর বা একটা হস্টেল দেখে রেখো। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ও বাড়ি আর যাব না আমি। আমার নিজের কিছু টাকা আছে। তোমাকে চেক লিখে দোব, তুমি নার্সিং হোমের সব দেনা তা থেকে শোধ করে দিও।

নরেন মৃদুস্বরে জবাব দিল, এসব ভাবনা আমাকে ভাবতে দাও না। তুমি চুপচাপ বিশ্রাম নাও। একদম মন খারাপ করবে না। উল্টোপাল্টা কথা বললে আমি সত্যি সত্যি রাগ করব।

তপতী কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে তারপর বলল, ইউ নো নরেন--আই হ্যাভ লস্ট এভরিথিং, মাই প্রাইড, মাই হোম, এভরিথিং এ লেডী কুড লষ্ট ইন হার লাইফ। আই বিকেম এ ভিকটিম অব দি সারকমসট্যানসেস। কিন্তু কেন এমন হলো। আমার কোন পাপে ভগবান আমাকে এতবড় একটা শাস্তি দিলেন।

নরেন বলল, আবার উল্টোপাল্টা বকছো। তুমি দুঃখ পেলে আমার কতটা

লাগে তুমি বুঝতে পার না। প্লিজ তপু---আমার জন্যে অন্ততঃ তুমি একটু শান্ত হয়ে থাক।

একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল তপতীর বুকের ভেতর থেকে। বলল—তুমি হয়ত শোননি এখনও যে এ্যাকসিডেন্টের পর জীবনে আর কোনদিন আমি মা হতে পারব না।

—স্টপ ইট তপু। স্টপ ইট। নরেন চীৎকার করে ওঠে। বলে, মিথ্যে কথা তোমার মনের ভুল—কে বলেছে তোমায় একথা—ইট্‌স এ লাই—এ্যাবসলিউট লাই।

—তপতী বড় করুণ করে হাসল। বলল- বৃথা সান্ত্বনা দিয়ে কি করবে বল। সত্য চাপা দিয়ে রাখবে কদিন।

নরেনের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল অঝোর ধারায়। তপতীর সারা মুখ নরেনের চোখের জলে ভিজে যাচ্ছিল। তপতী বলল—তোমার ভালবাসার ঋণ আমি জীবন দিয়ে শোধ করতে পারব না নরেন। তোমাকে আর বেশি কষ্ট দেবো না আমি দেখো। নরেনের হাতটা নিয়ে তপতী নিজের জলেভেজা মুখে বোলাতে লাগল।

নরেন কোন কথা বলতে পারল না, চুপ করে বসে রইলো।

(১২)

নার্সিং হোম থেকে ছাড়া পাবার দিন সকালে অলক এল। তপতী না চাইলেও অলক প্রায় রোজই আসতো। মালহোত্রও আসতো প্রায়ই। অলককে দেখে তপতী বলল, তুমি শুধু শুধু এলে। তোমাকে তো বলেছি যে আমি তোমার বাড়ি গিয়ে উঠতে পারব না।

অলক জবাব দিল, অকারণ জেদ করে লাভ কি তপতী। তুমি আমার স্ত্রী। আমার বাড়ি না গিয়ে থাকবে কোথায় তুমি।

—তোমার স্ত্রী বলে ভাবতে আমার ঘেন্না করছে নিজেকে। তাছাড়া

ভালবাসা ফুরিয়ে গেলে মিথ্যে একটা সম্পর্ক জোর করে ধরে রেখে লাভ কি? যত দিন যাবে সম্পর্কটা ততই খারাপ হতে থাকবে।

অলক তবু বলল, ভালবাসা ফুরিয়ে গেছে একথা বলছ কেন। এ্যাডজাস্ট-মেণ্টের অভাব হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু সম্পর্কতো ফুরিয়ে যায় নি। সব স্বামী স্ত্রীর মধ্যেই কোন না কোন কারণে অমিল-মতান্তর তো হয়েই থাকে। এতো নতুন কোন ব্যাপার নয়।

শান্ত কণ্ঠে তপতী বলল, মতের অমিল বলতে কি বোঝাতে চাইছো তুমি। এটাকে তুমি সামান্য মতের অমিল বলে ধরতে চাইছো। আমার দেহ ভাঙিয়ে জীবনের সিঁড়ি বেয়ে তুমি ওপরে ওঠার পথ করে নিলে। বউকে নিজের হাতে বসের বিছানায় শয্যা সঙ্গিনী করে পাঠাতে তোমার শিক্ষিত বিবেকে দংশন হল না একবার। তুমি তো জেনেশুনেই সেদিন একলা আমাকে পাঠিয়েছিলে মালহোত্রর বাড়ি। আর এতবড় একটা ব্যাপারকে তুমি সামান্য মতের অমিল বলে বোঝাতে চাইছো।

—তুমি ভুল বুঝছো আমায়। আমি তো আর তোমাকে মালহোত্রর সঙ্গে রাত কাটাবার কথা বলিনি। তুমি আমার স্ত্রী—ও কথা আমি কখনও তোমায় বলতে পারি। বলতে চেয়েছিলাম ভদ্রলোক আমাদের ভালবাসেন—তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে আনন্দ পান—একলা মানুষ—একটু কম্পানি দিও ওকে।

ঝাঁঝিয়ে উঠে তপতী বলল, এত বড় মিথ্যে কথা বলতে তোমার বুক কাঁপল না। অবশ্য আমার সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করে ছন্দার সঙ্গে রাত কাটাতে তোমার যখন বিবেকে বাধে না তখন এটা তোমার কাছে কোন ঘটনাই নয়। তুমি ঠিকই বলেছিলে পারমিসিভ সোসাইটিতে দেহ নিয়ে কেউ আজকাল মাথা ঘামায় না। যাক তোমার সঙ্গে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তুমি ডাইভোর্সের মামলা এনো। স্বেচ্ছায় আমি তোমাকে মুক্তি দোব। ভয় নেই তোমার, একটা পয়সাও তোমার আমি দাবি করব না।

অলক বলল, এটাই কি তাহলে তোমার শেষ কথা। তবু তোমাকে আমি ভেবে দেখবার সময় দিলাম। ঠিক আছে বাড়ি যখন যাবে না তখন কোথায়

যাবে বল আমি নামিয়ে দোব। কিছু টাকা অন্ততঃ তুমি রেখে দাও। তোমার খরচপত্র তো হবে কিছু।

শান্ত গলায় তপতী জবাব দিল, আমার টাকার দরকার নেই। তুমি তো জান আমার নিজের কিছু পৈত্রিক টাকা আছে। তাছাড়া নার্সিং হোমের শয্যায় অনেক বিচার বিশ্লেষণ করে খুব ভাল করে খতিয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এছাড়া আমার আর কোন পথ নেই। তোমার আমার পথ একেবারে আলাদা হয়ে গেছে। এণ্ড টুইন শ্যাল নেভার মিট এগেন।

হঠাৎ অলক বলে বসল, শুধু তো আমারই দোষ দেখছো তুমি। স্পষ্ট করে বলই না যে আমাকে ডাইভোর্স করে তুমি নরেনকে বিয়ে করতে চাও। ভণিতার আর দরকার কি।

জ্বলে উঠলো তপতী। রাগে অপমানে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলল.— তুমি এত নির্লজ্জ, এত নীচ। এতদিনে আমাকে তুমি এই চিনেছো। তুমি এত নীচে নেমে গেছো অলক। আর তোমার মত একটা নোংরা মনের লোককে আমি প্রাণভরে জীবনের সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়ে ভালবেসেছিলাম।

তপতীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে বলল, নরেন দেবতার চেয়েও বড় অলক। আমাকে অপমান করেছো কর—তবে নরেনকে আর তোমার মনের নোংরা দিয়ে কালি মাখিও না। নরেন যে কত মহৎ, কত বিরাট তা বোঝবার ক্ষমতা তুমি হারিয়ে ফেলেছো। তুমি আমার সামনে থেকে চলে যাও। তোমার নোংরা নিশ্বাসে আমার সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে অলক।

তপতী অঝোরে কাঁদতে থাকে। অলক কথা খুঁজে পায় না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অলক চলে গেল।

(১৩)

নরেন এল কিছুক্ষণ বাদে। সদা চঞ্চল হাস্যময় নরেনকে আজ খুব শান্ত এবং গম্ভীর লাগছিল। একটা বিষাদের ছায়া—সব হারানোর নিদারুণ বেদনা তার

সারা চোখ মুখে ফুটে উঠেছে। ঘরে ঢুকেই তপতীকে ঐ ভাবে বসে থাকতে দেখে বুঝলো অলক এসেছিল।

· কথা না বলে কিছুক্ষণ এটা সেটা নিয়ে নাড়া চাড়া করে ধীরে ধীরে বলল, তোমার টিকিট নিয়ে এসেছি। একটু বাদেই তোমার ট্রেন। তারপর আবেগে তপতীর হাত দুটো ধরে বলল, তপু, তোমার কাছ থেকে কোনদিন কিছু চাইনি আমি। কিন্তু আজ বলছি তোমার শরীর এখনও পুরোপুরি ভাল হয় নি। তুমি মার কাছে যাবার আগে আরো কিছুদিন কলকাতা থেকে যাও। ভাল করে সুস্থ হয়ে তারপর যেও। আমি বাধা দোব না। তোমাকে এই অবস্থায় ছেড়ে দিতে আমার মন চাইছে না। আমাকেও তুমি সঙ্গে নিচ্ছো না। অন্ততঃ মার কাছে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত তো আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারতাম। আমি তো কোন অপরাধ করিনি তপু তোমার কাছে, আমাকে কেন তুমি অকারণে শাস্তি দিচ্ছো।

তপতী নরেনের হাত দুটোকে ধরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, তোমার চাইতে আমার বড় আপনজন আর কে আছে নরেন। তোমাকে আমি কখনও দুঃখ দিতে পারি! যে জীবনটাকে ত্যাগ করে যাচ্ছি তার আর কোন চিহ্ন সঙ্গে নিয়ে যাবো না ঠিক করেছি। আজ থেকে আমার নতুন পথে যাত্রা শুরু। আমাকে একলা যেতে দাও নরেন। ভালবাসা দিয়ে আমার পথ আগলে রেখো না। আজকের দিনে হাসি মুখে আমায় বিদায় দাও তুমি। একেবারে রিক্ত-নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছি যদিও কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি তোমার অফুরন্ত ভালবাসা। দুঃখ কেবল তোমাকে কিছু দিতে পারলাম না।

নরেন বলল, অরুণবাবুর অনাথ আশ্রমে কবে নাগাদ যোগ দিতে যাচ্ছো।

তপতী বলল, মার কাছে কিছুদিন থেকে শরীরটাকে একটু ভাল করেনি। তুমি তো জানই অরুণদা আমায় দেখতে আসতে পারেনি কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী হাল ছিল বলে। লিখেছে যে তার আশ্রমের দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের সব ভার আমার ওপর দিয়ে যাবে।

—কিন্তু অরুণবাবু যে এত সহজে তোমাকে নিয়ে যেতে রাজী হলেন।

—সহজে রাজী হয়নি তাতো তোমায় আগেই বলেছি। অনেক বুঝিয়ে

চিঠি দিয়েছিল আমাকে যাতে অলকের সঙ্গে আমি আবার একটা মিটমাট করে নি। কিন্তু যখন জানল যে এ জীবনে আমি আর কোনদিন মা হতে পারব না—কোনদিন আর অলকের সঙ্গেও আমার মিটমাটের সম্ভাবনাই নেই, তখনই রাজী হল।

নরেন বলল—কিন্তু তপু। যে জীবন তুমি বেছে নিলে সে যে বড় কষ্টের তুমি পারবে কি?

তপতী মিষ্টি করে একটু হাসল। বলল, আমি যে সাধারণ ঘরের মেয়ে নরেন। কষ্ট, দুঃখ নিয়েই তো বড় হয়েছি। আমার চারটে বছরই তো জীবনের সব নয়।

—কিন্তু আমাকে যে তোমার কোন উপকারেই লাগতে দিলে না তুমি। এ দুঃখ আমার যে কোনদিন যাবে না।

—ভাল করে ভেবে দেখ নরেন, নতুন করে সংসার করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। কোন ঘরকেই আমি তো আর সন্তান দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারব না। তাই ঠিক করলাম জীবনে মাতৃত্বের যে স্বাদটা অপূর্ণ থেকে গেল অরুণদার আশ্রমের মা-বাবা-হারা ছেলেমেয়েদের মা হয়ে তা মিটিয়ে নোব। মা-হারা ছেলেমেয়েদের যদি কিছুটা মায়ের স্নেহ দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারি তবে লোভ আর মোহের সমাজে নোংরা ঘেঁটে যে শরীরটাকে ক্লেদাক্ত করে ফেলেছি তার কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত তো করতে পারবো।

নরেন কথা বলল না। পৃথিবীতে মানুষ ভাবে এক আর হয়ে যায় অন্য কিছু। তপতীর জন্যে নরেনের মনে একটা চাপা নিস্ফল বেদনা মাথা খুঁড়ে মরছিল।

তপতী আবার বলল, অরুণদার সঙ্গে তো আর এখন ভালবাসাবাসির খেলা খেলতে যাচ্ছি না। সেদিন তো শেষ হয়ে গেছে অনেক আগে। তাছাড়া তোমাকে বলিনি আগে অরুণদা আর বেশিদিন বাঁচবে না।

নরেন এ খবর জানত না। তাই বিস্ময়ে প্রশ্ন করে, কেন? কি হয়েছে অরুণবাবুর।

—ক্যান্সারে ভুগছে অরুণদা। প্রতিদিন পলে পলে মৃত্যুর প্রহর গুণে চলেছে। আর মৃত্যু যত কাছে এগিয়ে আসছে প্রাণপণে সর্বস্ব ভুলে দুঃস্থদের সেবায় প্রাণপাত করে দিচ্ছে অরুণদা। আমিও জানতাম না। অরুণদার আশ্রমের যে ভদ্রলোক আমাকে দেখতে এসেছিলেন তার কাছেই সব শুনলাম।

নরেন বলল, কিন্তু চিকিৎসা করে এখনও তো তাকে বাঁচিয়ে তোলা যেতে পারে তপু ?

—অরুণদা এখন সব চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে নরেন। ভদ্রলোক তাই বললেন। জান নরেন, আমার ধারণা আমার ওপর এক দুরন্ত অভিমানে অরুণদা এভাবে নিজেকে তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দিয়ে আমায় শাস্তি দিতে চাইছে।

গভীর বেদনায় নরেন বলল—তপতী ? ভগবান কি কেবল দুঃখ দেবার জন্যেই তোমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল। এই কি তাঁর বিচার হলো। কোন অন্যায় না করে তুমি কেবল দুঃখই পেয়ে যাবে শুধু।

—কে বললে আমি দুঃখ পাচ্ছি শুধু। যাঁকে জীবনে কিছু দিতে পারলাম না, আমার মত নগণ্য একটা মেয়েকে ভালবেসে যে জলতে জলতে নিভে যেতে বসেছেন, তাঁর জীবনের সাধনা—স্বপ্নকে যদি সফল করে তুলতে পারি তবেই তো তাঁর মহৎ ভালবাসাকে উপযুক্ত সম্মান দিতে পারব। অরুণদার স্বপ্নকে আমি জীবন দিয়ে জীবন্ত করে তুলবো। নিরাশ্রয় ছেলেমেয়েদের সেবায় যে মহান ব্রত তিনি নিয়েছেন তাকে আমি সফল করে তুলবোই নরেন তুমি দেখে দিও। নয়ত আমি আনন্দ পাব কিসে ? দুঃখকে জয় করব কি করে তাহলে !

নরেন তপতীর কাঁধে আলতো করে একটু চাপ দিয়ে আশ্বস্ত করে বলল—আমার বিশ্বাস আছে তুমি সফল হবে। স্বেচ্ছায় সর্বস্ব ত্যাগ করে যে পথে নেমেছে সে যদি না পারে তবে আর কে পারবে তপু ?

—অরুণদার আশ্রম এখন থেকে আমার পবিত্র তীর্থক্ষেত্র নরেন। জীবনে যাঁর মুখের হাসি আমি কেড়ে নিয়েছি মরবার সময় অন্ততঃ তাকে যেন

একটু স্বস্তিতে যেতে দিতে পারি? আমার প্রায়শ্চিত্তের তো এই শুরু নরেন। প্রার্থনা কোরো যেন আমি দুর্বল না হয়ে পড়ি কোনদিন।

তপতী অঝোরে কাঁদতে থাকে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নরেন বলল—তপু। আর দেরি করা ঠিক হবে না। এখন না গেলে গাড়ি ধরতে পারব না।

গোছগাছ করে তপতী আর নরেন বেরিয়ে পড়ল নার্সিং হোম থেকে।

পথে যেতে যেতে তপতী নরেনকে বলল—যাবার দিনে আমায় কথা দাও যে যত তাড়াতাড়ি পার একটা বিয়ে করবে তুমি।

নরেন কোন জবাব না দিয়ে নীরবে গাড়ি চালাতে লাগল।

তপতী আবার বলল, কথার জবাব দিচ্ছো না যে। তুমি বিয়ে না করলে আমি শান্তি পাব না নরেন। সবাই আমাকে দুঃখ দিলো—তুমি অন্ততঃ আমাকে আর দুঃখ দিও না লক্ষীটি। আজ আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে তোমায়। জান তো কথা না রাখলে আমি মরে যাবো।

হাত দিয়ে তপতীর মুখটা চেপে ধরে নরেন বলল—আর কখনও যদি উল্টোপাল্টা কথা বল তবে আমি যেখানে খুশী চলে যাব। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—ঠিক আছে। তুমি যদি খুশী হও তবে বিয়ে করব আমি।

এত দুঃখের মাঝেও তপতী বড় মিষ্টি করে হাসল। বলল—মনে থাকে যেন গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছো। আমায় কিন্তু আগে ভাগে জানাবে। যত কাজই থাকুক আমি নিজে এসে তোমার বউকে সাজিয়ে দোব। প্রাণভরে শুভকামনা জানিয়ে যাব তোমার বউকে।

নরেনের চোখে জল এসে গিয়েছিল। অস্ফুট স্বরে বলল—এত ভালবেসেও আমার প্রতি তুমি এত নিষ্ঠুর হলে কি করে তপু। কেন তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে যেতে দিচ্ছো না। কেন তোমার আশ্রমে আমার যাওয়া বারণ করে দিলে। আমি তোমার কি ক্ষতি করতাম তপু।

তপতী দুচোখ মেলে নরেনের দিকে চাইলো। তারপর নরেনের কাছে সরে এসে এই প্রথম তার ওষ্ঠে একটা সোহাগ চুম্বন এঁকে দিল। নরেনের কাঁধে মাথা রেখে স্বপ্নোত্থিতের মত অস্ফুট স্বরে বলল—আমার জীবন থেকে তোমাকে সরিয়ে না নিতে পারলে তুমি সুখী হতে পারবে না নরেন—তুমি জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। আমি যে তোমায় ভালবাসি নরেন—তোমার ক্ষতি চাইবো কি করে?

—তুমি আমার ক্ষতি করবে একথা কেন ভাবছো—নরেন বলল।

—এ ছাড়াও যে জীবনে আমি যাচ্ছি সে তো তপস্বিনীর জীবন। আমি চাই না কোন লোভ—কোন পিছুটান, কোন আকর্ষণ আমাকে আমার কর্তব্য ভুলিয়ে দেয়। আমাকে তুমি ভুল বুঝো না নরেন। তুমি সুখী হতে না পারলে আমি যে নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না কোনদিন।

ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গিয়েছিল। নরেন তপতীকে ট্রেনে তুলে দিয়ে কোথায় কি মালপত্র রেখেছে বুঝিয়ে দিল। তারপর বলল—তপু, যখন তোমার দরকার হবে—তা সে যত ছোটই হোক আর যত বড়ই হোক আমাকে জানাতে দ্বিধা কোরো না। আর মাঝে মাঝে কেমন থাকো জানিও। তোমাকে চিনি—তাই এর বেশি আর কিছু চাইতে পারলাম না।

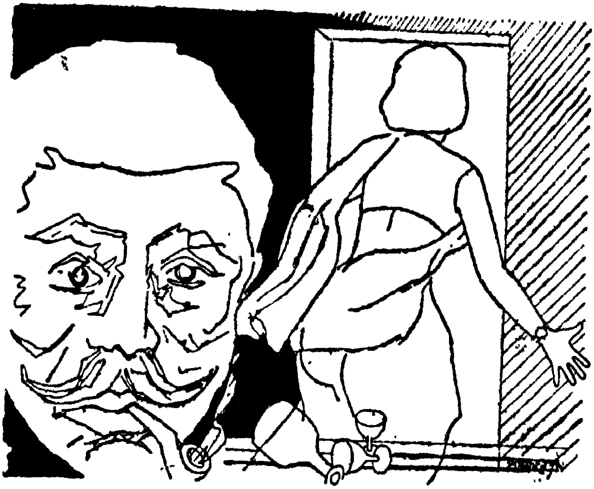
ট্রেন ছাড়ার প্রথম সঙ্কেত বেজে উঠলো। তপতী ব্যাগ থেকে একটা ছোট বাক্স বার করে নরেনের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, এ হারটা আমার মা বিয়ের সময় আমাকে দিয়েছিলেন—এটা একান্তভাবে আমার নিজস্ব জিনিষ। এটা তোমাকে নিতেই হবে। তোমার স্ত্রীর জন্যে আমার সামান্য একটু প্রীতি উপহার। তুমি না নিলে আমি খুব দুঃখ পাব মনে।

নরেন না করল না।

ট্রেন চলতে শুরু করেছিল ধীরে ধীরে। গাড়ি থেকে নেমে এসে ট্রেনের সঙ্গে চলতে চলতে তপতীর হাতটা ধরে নরেন বলল, তোমার ভালবাসার মহত্বে আমি হেরে গেলাম তপু। তোমার নতুন যাত্রা পথে আমার সবটুকু শুভকামনা জানিয়ে রাখলাম। তোমার সাধনায় তুমি সফল হবেই তপু।

এতবড় মন নিয়ে কেউ কোন কাজে ব্যর্থ হতে পারে না। তোমার স্থান আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরদিনের মত ভাস্বর হয়ে জ্যোতি দেবে। সেই আলোতে আমি জীবনের পথ খুঁজে নেব তপু।

ট্রেনটা ক্রমেই এগিয়ে চলে যাচ্ছে। ট্রেনের জানলা দিয়ে তপতীর ঝুঁকে পড়া মুখটা ক্রমশঃই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অপস্রিয়মান ট্রেনের দিকে চেয়ে চেয়ে তপতীর উদ্দেশে হাত দেখাতে দেখাতে নরেনের দুচোখ উপচিয়ে টপটপ করে জল ঝরে ঝরে প্ল্যাটফর্মের মাটি ভিজিয়ে দিতে লাগল।



একালের গল্প

উৎসর্গ ঃ

আমার সাহিত্য জীবনের দীক্ষাগুরু পিতৃপ্রতিম
সাহিত্যিক সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসুকে—

(প্রস্তাবনা)

গাড়ীটা এসে আওয়াজ করে থামলো পোর্টিকোর নীচে। উর্দিপরা দারোয়ান সম্ভ্রমে এগিয়ে এসে গাড়ীর দরজা খুলে সেলাম জানালো। ধীর পদক্ষেপে পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গাড়ী থেকে নামলেন অতনু মিত্র —মিঃ এ, কে, মিটার।

অতনু মিত্র ভারতের শিল্পপতি মহলের প্রথম সারির একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। সৌভাগ্যের সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে উঠতে উঠতে অতনু মিত্র প্রভাব, প্রতিপত্তি, আর্থিক সাফল্য সবই নিজের করায়ত্তে এনে ফেলেছেন। অবশ্য নিজের চেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের জোরেই। সেদিক থেকে বলতে গেলে মিঃ মিটারকে এক কথায় বলতে হয় সেলফ মেড ম্যান।

উত্তরপঞ্চাশ অতনু মিত্র রাশভারী সুপুরুষ। মেদহীন, ঋজু বলিষ্ঠ দেহ— নিখুঁত সাজপোষাক। কাজে অকাজে বছরের মধ্যে বেশীর ভাগ সময়েই বিদেশে থাকেন। সারা ভারত জুড়ে তাঁর নানান ব্যবসা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

অতনু মিত্র ঘরে ঢুকে তাঁর খাস বেয়ারা মতিকে ডেকে বললেন -আজ আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। কেউ দেখা করতে এলে বলে দিও আজ আমি কারুর সঙ্গে দেখা করব না। ফোন এলেও না করে দিও—কেবল মেহেতা কোম্পানীর আর ডি মেহেতা ফোন করলে আমার ঘরে লাইনটা দিয়ে দিও।

মতি চলে যাচ্ছিল। অতনু মিত্র বললেন—মিমি বাড়ী ফিরলে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে বোল।

মতি কিছুক্ষণ বাদে ইমপোরটেড হুইস্কির বোতল, গ্লাস, বরফ আর সোডা এনে টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে গেল। সঙ্গে এক প্লেট ফিশ ফিঙ্গার। ড্রিঙ্কস এর সাথে ফিশ ফিঙ্গার মিটার সাহেবের খুব প্রিয় জিনিষ।

অতনু মিত্র ড্রিংকস করতে করতে রবিশংকরের বাজনার একটা টেপ চালিয়ে নিবিষ্ট মনে শুনতে লাগলেন। মাঝে মাঝে একলা ঘরে অতনু মিত্র ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক শুনতে খুব পছন্দ করেন। বিশেষ করে সেতার এবং সরোদ। বিভিন্ন আসর থেকে গুণী শিল্পীদের বাজনা তিনি টেপ করে রেখে দিয়েছেন। অতনু মিত্রের জীবনে অবসর খুবই কম। তবু মাঝে মাঝে যখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন একান্তে নিজের ঘরে বসে বাজনা শোনেন।

জগৎ বড় বিচিত্র। প্রত্যেক মানুষই নিজের নিজের একটা গড়ে তোলা বিশেষ জগতে মাঝে মাঝে বিচরণ করে। জীবন থেকে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করতে চায় বোধহয়। নয়ত অতনু মিত্রের অভাব কিসের। ঐশ্বর্যের সুউচ্চ চূড়ায় বসে পার্থিব জগতের সকল সম্পদ আর বিলাসকে দুহাতে আহরণ করে চলেছেন অতনু মিত্র। মানুষের সকল কামনার বস্তু না চাইতেই তার কাছে এসে ধরা দেয়। এত ঐশ্বর্য আর বিলাসিতার মাঝেও অতনু মিত্র মাঝে মাঝে হাঁফিয়ে ওঠেন—নিঃসঙ্গ বোধ করেন খুব। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা পোকার মত কাটতে থাকে তাঁর মনের ভেতরটা। তখন এক দুঃসহ জ্বালায় ছটফট করতে থাকেন অতনু মিত্র। ভেবে পান না তিনি এত পেয়েও কিসের একটা অভাব বোধ তাঁকে দহন করতে থাকে, কেন ?

অতনু মিত্র মাঝে মাঝে ভাবেন যে সকলে তার বাইরেটাই দেখলো—তার আসল চেহারাটার পরিচয় তো কেউ নিল না কোনোদিন। অতনু মিত্র দাম্ভিক, বদ মেজাজী পয়সার কাঙাল, মদ্যপ, স্বার্থপর—সবই হয়ত ঠিক। কিন্তু এর বাইরেও তো কিছুটা থাকে—সেটা কেন লোকে দেখতে পায় না। অন্যের কথা দূরে থাক তার নিজের মেয়েও তো জানতে চায় না—বুঝতে চায় না তাঁকে। মনের এই অবস্থায় অতনু মিত্র ডায়েরী লেখেন। মনের অসংবদ্ধ ভাবনাকে কথায় ধরে রাখতে চেষ্টা করেন।

অতনু মিত্র মদ্যপান করতে করতে বাজনা শুনছিলেন আর ভাবছিলেন সাত পাঁচ। টেপে তখন মাঝ খাম্বাজের বেদনা ঝরে ঝরে পড়ছে। শিল্পীর

হাতের যাদুতে যেন অশরীরী কোন ব্যর্থ প্রেমিকার যন্ত্রণা বাঙময় হয়ে উঠছে। একটা চাপা বেদনায় অতনু মিত্র নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। টপ টপ করে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। হঠাৎ খুব প্রাণ খুলে অতনু মিত্রের কাঁদতে ইচ্ছে করল। পরপর দু চুমুক হুইস্কি গলায় ঢেলে অতনু মিত্র চোখ মুছে ফেললেন। মনে মনে তাঁর এই দুর্বলতায় লজ্জা পেলেন খুব। কেউ যদি দেখে ফেলতো তবে কি ভাবতো। আবার ভাবলেন দেখলো তো কি হয়েছে। আমি মিঃ এ, কে, মিটার হলেও তো মানুষ। আমারও তো সকলের মত সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা সবই রয়েছে। আমারও তো কান্না পেতে পারে। তবে আমি প্রাণ খুলে ক ঁাদতে পারি না কেন?

অতনু মিত্র হঠাৎ উঠে টেপটা বন্ধ করে দিলেন। মনে মনে বল্লেন—আমি দুঃখ পেতে চাইনা—দুঃখকে জয় করতে চাই। শিল্পীর বাজনায় দুঃখের সুরের মধ্যে সৃষ্টির যে আনন্দ বইছে তাকে আমি মনের ভেতর নিতে পারছি না কেন।

অতনু মিত্র টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে ডায়েরী লিখতে বসলেন। লিখলেন —

'আমার মনে কেন আজ সারা পৃথিবীর সব দুঃখ এক হয়ে মিশে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। এত প্রাপ্তির মাঝে আমার মনের ভেতরে একটা অভাবের কাঙালপনা কেন যে জেগে ওঠে বুঝি না। আমার এই অনুভূতির কথা কাকে যে জানাব জানিনা।

আমার পৃথিবীতে আমি আজ বড় নিঃসঙ্গ— বড় একা—ভীষণভাবে একা। আমি আর একাকীত্বের ভার সহ্য করতে পারছিনা।

এতদিনের পরে হঠাৎ আজ খোলা জানলা দিয়ে আকাশে পূর্ণিমার ভরা চাঁদটা নজরে এলো। কতদিন যে খোলা আকাশের দিকে তাকাই নি। জানলা দিয়ে এক ফালি জ্যোৎস্না ঘরে এসে পড়েছে। হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ল আজ। দোষ আমি করেছিলাম ঠিক। কিন্তু তা বলে তুমি আমায় এমন একটা শাস্তি দিয়ে গেলে। আমি তো তোমায় ভালবাসতাম মোহিনী—সেটা তো মিথ্যে নয়—তোমাকে তো আমি অবিশ্বাস করিনি—আমার ভালবাসা তুমি দেখতে পেলেনা মোহিনী, তবে—'

লেখায় বাধা পড়ল। ঘরে এসে ঢুকলো মিমি। অতনু মিত্রের একমাত্র মেয়ে। বর্ষার একগুচ্ছ তাজা ফোটা রজনীগন্ধার স্তবক যেন। উদ্ধত যৌবন ভারে গর্বিত সুগঠিত তনুদেহ। চোখে মুখে একটা বিদ্যুতের ঝিলিক। সারা অবয়ব ঘিরে একটা কাঠিণ্য আর কোমলতার দ্বৈত মিশ্রণ, বয়স ত্রিশ ছুঁই ছুঁই করছে। মিমি অর্থাৎ মৌসুমী মিত্র।

মিমি বলল, বাপি, তুমি আমায় ডেকেছিলে। মতি বলল তোমার নাকি শরীর খারাপ। একে তোমার হাই প্রেসার। তার ওপর যদি তুমি রাতদিন ড্রিঙ্ক কর তবে শরীর ভাল থাকবে কি করে।

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অতনু মিত্র বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া একটা মুখের ছায়া দেখতে পেলেন। মিমির চেহারায় তার মায়ের আদলটা পুরোপুরি ফুটে উঠেছে। মোহিনী যেন মিমির ভেতর দিয়ে আবার তাঁর কাছে এসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অতনু মিত্র মেয়ের মাথায় সস্নেহে একটা হাত রাখলেন। কতদিন তাঁর মেয়ের সঙ্গে দেখা হয় না। সারাদিন কাজ, পার্টি, মিটিং, বিদেশ ভ্রমণ এই নিয়েই তো তাঁর জীবন। মেয়ের দিকে আর তাকাবার অবসর কোথায়। মিমি ছেলেবেলা থেকেই গভর্নেসের কাছে মানুষ। দরকার অদরকারে বাড়ির ম্যানেজার বৃদ্ধ সুশোভন বাবুই সব।

অতনু মিত্র বললেন—নেকস্‌ট্ উইকে আমি গালফ্ কান্ট্রিতে যাচ্ছি বিজনেস ট্যুরে। আমার ইচ্ছে তুমিও আমার সঙ্গে চলো। জাস্ট সিক্স উইকের ব্যাপার। আমার ইচ্ছে বিজনেসের কিছু কিছু ব্যাপারের ভার তোমার ওপর আমি ছেড়ে দেব। আমার তো ছেলে নেই। তুমি আমার একধারে ছেলে আর মেয়ে।

মিমি কোন কথা বলল না। চুপ করে রইল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অতনু মিত্র আবার বললেন—দেখ মিমি—তোমার বোঝবার মত যথেষ্ট বয়স হয়েছে। তোমাকে আগেও অনেকবার বলেছি। তুমি বুঝতে চাও না কেন জানি না—বাট ইট ইজ এ ফ্যাক্ট দ্যাট অর্ণব আর তোমার জীবনের ধারা ভিন্নমুখী। এণ্ড টুইন শ্যাল নেভার মিট। আমার

মনে হয় অর্ণবের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা ঝেড়ে ফেলাই ভাল। তাতে তোমার মঙ্গল হবে।

মিমি বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে খুব শান্ত স্বরেই বলল—বাপি আমার ভাল মন্দ নিয়ে সারা জীবন যখন খুব একটা কিছু চিন্তা ভাবনা করবার সময় তুমি পাওনি—তখন আমার ভাবনাটা না হয় আমাকেই ভাবতে দাও। আমি ছেলেমানুষ নই—ভালোমন্দ বোঝবার যথেষ্ট ক্ষমতা আমার আছে বলেই আমার বিশ্বাস। কাজেই ও প্রসঙ্গ থাক। আর বাইরে যেতেও আমার ভাল লাগছে না। তোমার সঙ্গে বিদেশে ঘুরে ঘুরে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমাকে আমার মত করে থাকতে দাও তুমি।

অতনু মিত্র বললেন—তাহলে বিজনেসের ব্যাপারেও তুমি আমাকে হেল্প করতে চাও না।

মিমি বলল—অনেকবার তোমাকে বলেছি বাপি—আই হেট ইওর ওয়েলথ। তোমার বিজনেস, বিষয় সম্পত্তি কোন কিছুর ওপর আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। আমাকে তুমি কেবল আমার নিজের মত করে থাকতে দাও। এণ্ড ইফ ইউ ইনসিস্ট—তাহলে এ বাড়ি থেকে চলে যাওয়া ছাড়া আমার আর উপায় থাকবে না। তাছাড়া ইচ্ছে না থাকলেও তোমার বিজনেস মাঝে মধ্যে আমি তো দেখাশোনা একটু করিই।

অতনু মিত্র একটু দুঃখ পেলেন মনে। বললেন—তোমার কোন ইচ্ছের পথেই তো আমি বাধা হয়ে দাঁড়াইনি। তবে হ্যাঁ—এটাও ঠিক যে পিতার উপযুক্ত কর্তব্যও তেমন করে হয়ত আমি পালন করতে পারিনি। কিন্তু পিতা হিসেবে আমার তো একটা দায়িত্ব আছে। হাউ ক্যান আই ফরগেট দ্যাট। আজ পর্যন্ত তুমি বিয়েতে মত দিলে না। কত ভাল ভাল ফ্যামিলির ছেলে তোমাকে গৃহিণী করবার জন্যে উৎসুক ছিল। আমি খালি বুঝতে পারি না অর্ণবের ভেতর তুমি কি দেখেছো? একটা লস্ট ম্যান ইন দিস ওয়ার্ল্ড। জীবনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই যার তাকে বিয়ে করে ভাবছো তুমি সুখী হতে পারবে? কি আছে ওর মধ্যে?

মিমি একটু হাসল মিষ্টি করে। তারপর বলল—অর্ণবকে আমি বিয়ে করব

এ ধারণা তোমার মাথায় এল কি করে। তাছাড়া আমি বিয়ে করতে চাইলেই অর্ণব রাজী হবে কেন? তবে বাপি একটা কথা তোমায় কোনদিন বলিনি আজ বলছি—অর্ণব তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। ওর তো অনেক ক্ষতি করবার চেষ্টা তুমি করলে। লোভ দেখিয়ে ওকে বশে আনার চেষ্টা করলে—মিঃ এ, কে, মিটারের প্রভাব, প্রতিপত্তি, বিত্ত সব কিছুকে তুচ্ছ করেই তো অর্ণব আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। অর্ণবকে তুমি তো জয় করতে পারলে না বাপি। এ জগতে তুমি যা চেয়েছো যে করেই হোক তা তুমি করায়ত্ত করেছো। হেরে গেলে খালি অর্ণবের কাছে। আসলে অর্ণবের মাঝে তোমার পরাজয়ের চেহারাটা দেখে তুমি ভয় পাও। ইউ আর স্কেয়ার্ড অফ হিম।

উত্তেজিত হয়ে উঠলেন মিঃ এ, কে মিটার। বললেন—অর্ণবের আমি ক্ষতি করতে চেয়েছি এ ধারণাটা তোমার মাথায় ও হয়ত ঢুকিয়ে দিয়েছে। আসলে আমি চেয়েছিলাম অর্ণব মানুষ হয়ে উঠুক। এ্যাফটার অল হি ইজ এ ব্রাইট ইয়ং ম্যান। আমি চেয়েছিলাম ও যাতে তোমার যোগ্য হয়ে উঠতে পারে। এণ্ড আই ওয়াণ্টেড টু হেল্প হিম।

মিমি আবার হাসল একটু। বললো—তোমার হেল্প করার ঔদার্যে বেচারীকে আজ কি ভাবে দিন কাটাতে হচ্ছে ভাব। তবে তোমার অহেতুক আশঙ্কার কোন কারণ নেই। তুমি অর্ণবকে চিনতে পারনি। এত বিচক্ষণ হয়েও তুমি এক জায়গায় ভুল করলে বাপি। তুমি বোধহয় জাননা যে অর্ণব আমাকে ভালবাসে না।

মিমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। বলল—অনেক রাত হয়েছে। তুমি কিছু খেয়ে শুয়ে পড় বাপি। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।

মিমি চলে গেল। মেয়েকে মাঝে মাঝে চিনতে পারেন না তিনি।

অতনু মিত্র আবার গ্লাসে নতুন করে পানীয় ঢেলে পান করতে লাগলেন।

(২)

অর্ণব বিশ্বাস ছেলেবেলাতেই বাবাকে হারিয়েছিল। মাও মারা গেছেন কলেজের গণ্ডী পেরোবার আগেই। বাবা কলকাতায় ছোট একটা বাড়ী

রেখে গেছেন—তার একদিকটা ভাড়া দেওয়া। বাবা বাড়ি ছাড়াও কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন। মা বেঁচে থাকতেই সে তার একমাত্র বোনের বিয়ে দিয়েছিলো। বোন এখন থাকে সুদূর উত্তর প্রদেশের এক শহরে। কাজেই সংসারে অর্ণব এখন একাই।

প্রেসিডেন্সিতে পড়ার সময়েই অর্ণবের আলাপ হয়েছিল মিমির সঙ্গে। অর্ণব তখন ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। মিমি সবে ফার্ষ্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে। অর্ণব ইউনিয়নের পাণ্ডা ছিল। খুব ভাল বক্তৃতা এবং আবৃত্তি করতে পারতো। সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত ছিপছিপে চেহারা। ফ্রেশার্স ওয়েলকাম অনুষ্ঠানে অর্ণবের আবৃত্তি শুনে মিমির খুব ভাল লেগেছিল।

মিমিই যেচে আলাপ করেছিল অর্ণবের সঙ্গে। বলেছিলো—আপনি তো খুব সুন্দর আবৃত্তি করেন।

অর্ণব জবাব দিয়েছিলো—আপনার মত স্মার্ট এবং সুন্দরী মেয়ের মুখ থেকে নতুন কিছু শুনবো আশা করেছিলাম। আবৃত্তিটা আমি ভালোই করি - সেটা নতুন কোন কথা নয়। তবে আপনার ভালো লেগেছে জেনে ভালো লাগলো।

মিমি দমে যাবার মেয়ে নয়। মনে মনে ভাবলো এর একটা যোগ্য জবাব দেওয়া দরকার। বলল—আমার ভালো লেগেছে তা তো বলিনি। বলেছি যে আপনি সুন্দর আবৃত্তি করতে পারেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমার ভালো লেগেছে।

মিমি আরো কি বলতে যাচ্ছিল। অর্ণব বাধা দিয়ে বলল—দেখুন মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করাটা আমি একদম পছন্দ করি না—প্রথম আলাপের দিন তো নয়ই। কাজেই ঝগড়াটাকে আপাততঃ ছুটি দিয়ে দি।

মিমি কিছু বলল না। অর্ণব আবার বলল—সামনেই আমাদের কলেজ ইউনিয়নের ইলেকশান। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে আমাদের দলের হয়ে দাঁড়ান না।

মিমি একটু হাসল। বলল—আপনার দূরদৃষ্টির কিন্তু প্রশংসা করতে

পারলাম না। আমাকে চিনলেন না—জানলেন না। সামান্য একটু আলাপেই দলের হয়ে দাঁড় করাতে চাচ্ছেন। আপনি কি রকম নেতা তা তো বুঝতেই পারছি।

অর্ণব বলল—বেশী পরিচয় থাকলেই কি মানুষকে বেশী করে চিনতে পারা যায়। তবে কেন জানিনা মনে হচ্ছে আমার সিলেকশানে কোন গলদ নেই।

মিমি বলল—নিজের ওপরে এতটা বিশ্বাস ভাল নয়। আপনি তো আর অন্তর্যামী নন যে মানুষকে দেখেই চিনতে পারবেন।

অর্ণব মিমির চোখের দিকে তাকিয়ে খুব শান্ত স্বরে বলল—অন্তর্যামী নই ঠিকই—তবে একটা কথা বলতে পারি এত সুন্দর চোখ যার সে কখনও মানুষকে বিট্রে করতে পারে না।

মিমি একটু লজ্জা পেল। বলল—থ্যাঙ্কস ফর দি কমপ্লিমেণ্ট। বিট্রে করতে পারি কি না সেটা কার্যক্ষেত্রে প্রমাণিত হতে দেরী লাগবে। তবে হাতে হাতে যে প্রশংসাটা পাচ্ছি সেটা ছাড়ব কেন!

থার্ড ইয়ারের সুমনা পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো। হঠাৎ বলে উঠল, কি ব্যাপার অর্ণব দা—লাভ এ্যাট দি ফার্ষ্ট সাইট মনে হচ্ছে। একেবারে শরবিদ্ধ পাখীর অবস্থা।

অর্ণবও একটু লজ্জা পেয়েছিল মনে মনে। অবস্থাটা সহজ করবার জন্যে বলল—ওই তো তোমাদের বাঙালী মেয়েদের স্বভাব। কাউকে একটু ভালো বললেই কি ব্যাপারটা দুর্বলতা হয়ে যায়। তারপর মিমির দিকে চেয়ে বলল—আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি কিছু ভেবে কথাগুলো বলিনি।

মিমি চলে যাচ্ছিল।

অর্ণব আবার বলল—আরে আপনার নামটাই তো জিজ্ঞেস করা হল না।

মিমি গভীর দৃষ্টি মেলে অর্ণবের দিকে ভালো করে চাইলো। উত্তর দিতে

গিয়ে গলাটা একটু কেঁপে উঠল। মিমি নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করল। আশ্চর্য! সে তো জীবনে এই প্রথম কোন ছেলের সঙ্গে কথা বলছে না। তবে অর্ণবের দিকে চেয়ে তার এরকম হচ্ছে কেন? মিমির মনে এ একটা নতুন অভিজ্ঞতা—নতুন অনুভূতি। মিমি খুব আস্তে করে জবাব দিল—মৌসুমী মিত্র। ফার্স্ট ইয়ার আর্টস। তবে সবাই আমাকে মিমি বলেই ডাকে। আপনিও বলতে পারেন।

সুমনা নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে উঠল—লেট মি ইনট্রোডিউজ ইও অলসো অর্ণব দা। মিমি নামটাতো তুমি আগেই শুনে ফেলেছো। বাট স্টিল বলছি—হেয়ার ইজ আওয়ার গ্রেট অর্ণব বিশ্বাস। ফোর্থ ইয়ার ইংলিশ অনার্স। জেনারেল সেক্রেটারী অফ আওয়ার ষ্টুডেন্টস ইউনিয়ন—এ গুড ডিবেটার—গুড ওরেটার এণ্ড এ ওয়েলবিহেভড্ হ্যাণ্ড সাম ইয়ং ম্যান।

তারপর আর একটু এগিয়ে এসে মিমির কানে ফিস ফিস করে বলল—অর্ণব দা কলেজের অনেক মেয়েরই স্বপনপুরীর রাজপুত্তুর। ঘোড়া ছুটিয়ে একের পর এক রাজ্য কেবল জয় করেই চলেছে। কিন্তু দাস ফার এণ্ড নো ফারদার। অধিকৃত রাজ্যে নিজের রাজত্ব কায়েম করবার আর কোন চেষ্টাই নেই। অনেক কাজল চোখের বিলোল কটাক্ষের তীর এখনও অর্ণবদার বক্ষে গিয়ে বিঁধতে পারে নি। মনে হয় অর্ণবদা হৃদয়ের ওপর একটা ইমিউনিটির বর্ম পরে থাকে সব সময়। তিন বছরে এই প্রথম মনে হল নতুন ম্যাঠে নেমে বোলিং এর পয়লা বলেই তুমি ক্লীন বোলড করে দিয়েছো অর্ণব দাকে।

লজ্জায় মিমির মুখে সিঁদুর ছড়িয়ে পড়ল। অস্ফুটস্বরে বলল—যাঃ!

সুমনা অর্ণবের দিকে তাকিয়ে বলল—আজকের দিনে আমাদের কফি না খাওয়ানো তোমার হৃদয় হীনতার ব্যাপার হয়ে যাবে। দেখছো না মিমির সুন্দর মুখটায় কি রকম সূর্যাস্তের লাল রঙ খেলা করছে।

অরুণাংশু এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল সব। বাধা দিয়ে বলল—সুমনা উপমাটা মোটেই ভালো হল না। সূর্য ওঠার উষালগ্নে তোমার চোখে সূর্যাস্তের রংটাই ধরা পড়ল। সূর্যোদয়ের মিষ্টি লাল আভাটাও তো তুমি দেখতে পারতে।

তোমার এই দৃষ্টির অস্বচ্ছতার জন্যে আজও একটা রিয়েল বয় ফ্রেণ্ড তোমার ভাগ্যে জুটল না। সুরুর আগেই তুমি শেষ দেখতে চাও।

সুমনা অরুণাংশুকে একটা কিল মেরে বলল—বয় ফ্রেণ্ড না জুটলেও ভেবোনা তোমার কণ্ঠে দোলাবার জন্যে আমি মালা গাঁথতে বসবো। চল অর্ণবদা আমরা কফি হাউসে গিয়ে সেলিব্রেট করি।

কফি হাউসের আড্ডা সেরে ওরা যখন কলেজ ষ্ট্রীটে নামল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

মিমি বলল—আমি লেকের কাছে থাকি। ওদিকে কেউ গেলে আমি লিফট দিতে পারি।

অরুণাংশু, সুমনা আর তার বান্ধবী থাকে শ্যামবাজারের দিকে। অর্ণব থাকে ভবানীপুরে। তাই ঠিক হল অর্ণব যাবে মিমির সঙ্গে।

সুমনা আবার ফোরণ কাটল—ভাগ্য করে এসেছো অর্ণবদা। প্রথম আলাপেই লিফট পেয়ে গেলে। একটু বেশীই পেলে বোধহয়।

অরুণাংশু ধমক দিয়ে বলল—সুমনা প্রথম দিনেই বাড়াবাড়ি ঠিক নয়—মিমি বেচারা ঘাবড়ে যাবে।

গাড়িতে যেতে যেতে অর্ণব মিমিকে বলল—আপনি ফার্স্ট ইয়ারে পড়েন, আমি ফোর্থ ইয়ার। রীতিমত গুরুজন বলতে পারেন। তাই অনুমতি পাই বা না পাই আজ থেকে আপনাকে আমি কিন্তু তুমি বলেই ডাকবো।

মিমি বলল—এতে আবার অনুমতির কি আছে। আপনি আমায় তুমি বলেই ডাকবেন। আপনি করে বললেই বরং আমার অস্বস্তি হোত।

অর্ণব একটা সিগারেট ধরালো। দুবার টান দিয়ে মিমির দিকে ফিরে বলল—মিমি সাজ পোষাকে তোমাকে খুব দাম্ভিক বলে মনে হয়। কিছু মনে কোরোনা—এই মড সাজ পোষাকের সঙ্গে তোমার চেহারাটা ঠিক খাপ খায় না।

মিমি হাসতে হাসতে বলল—সাজ পোষাক দেখে কাউকে দাম্ভিক বা বিনয়ী বলে চেনা যায় জানতাম না তো।

অর্ণব বলল, ঠিক তা নয়। কেন জানিনা তোমার চোখ দেখে আমার কেবল মনে হচ্ছে যে তোমার মনের আসল চেহারাটাকে তুমি তোমার সাজ পোষাকের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চাইছো। অন্ততঃ তোমার চোখ তাই বলে।

মিমি আশ্চর্য হল একটু। বলল—বুঝলাম না। আমার চোখ কি কথা বলে আপনার মুখেই না হয় শুনি একটু।

অর্ণব বলল—তোমাকে আমি আজই প্রথম ভালো করে দেখলাম। আলাপও হয়েছে মাত্র ঘণ্টা দু'এক হবে। কিন্তু তোমার চোখ দুটো দেখে আমার মনের ভেতর কেবল মনে হচ্ছে কোথায় যেন তোমার একটা চাপা বেদনা রয়েছে। তোমার ঐ সুন্দর চোখ দুটো দিয়ে তা প্রকাশিত হতে চাচ্ছে আর জোর করে তুমি তাকে দমিয়ে রাখতে চাইছো।

মিমি অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না। তারপর আস্তে আস্তে বলল—স্ট্রেঞ্জ! আপনার কেন এমন মনে হচ্ছে জানিনা। বাট ইউ আর এ্যাবসলিউটলি মিসটেকেন অর্ণবদা! আমার জগতে দুঃখের কোন স্থান নেই। আপনি হয়ত জানেন না যে আমি মালটিমিলিয়নীয়ার এ, কে, মিটারের একমাত্র মেয়ে। আমি না চাইতেই সব পেয়ে যাই। আমার জীবনের ডিক্সনারী থেকে দুঃখ নামক শব্দটা আমার বাবা সযত্নে বাদ দিয়ে দিয়েছেন।

তারপর একটু তরলকণ্ঠে মিমি আবার বলল—নিজেকে একজন একসপার্ট মনস্তত্ত্ববিদ ভাববেন না।

অর্ণব বলল—জাস্ট কথাটা মনে হল তাই বললাম। হাজরার মোড়ে গাড়ি আসতেই অর্ণব বলল—গাড়ি থামাতে বল। আমি এখানেই নামবো।

মিমি বলল—খুব কাজ না থাকলে চলুন না আমাদের বাড়ি। এক কাপ চা খেয়ে আসবেন অন্ততঃ।

অর্ণব বলল—আজ না। অন্য একদিন যাব।

মিমি একটু অভিমানের সুরে বলল—এই যে বল্লেন মনে যা আসে তাই বলে

ফেলেন। এখন কিন্তু সত্যি কথাটা বললেন না। আসলে আমার কম্পানি আপনার ভালো লাগছে না সেটাই বলুন না।

অর্ণব হেসে ফেলল। বলল, তোমার অতি বড় শত্রুও কখনও বলবে না মিমি যে তোমার কম্পানি ভালে লাগে না। আসলে কি জান বাড়িতে তো আমি একাই থাকি। কাজ করবার ছেলেটি আজ সিনেমা দেখতে যাবে। আমি বাড়ি না গেলে ওর যে ছুটি হবে না।

মিমি বলল—কেন? বাড়িতে আপনার আর কেউ নেই। বাবা-মা-ভাই-বোন।

অর্ণব বলল—মা বাবা এখন পাস্ট টেন্স। একমাত্র বোনের বিয়ে হয়ে গেছে অনেক দিন। আমার সংসারের সাম্রাজ্যের আমিই একচ্ছত্র অধিপতি। সেনাপতি, পাত্র, মিত্র সভাসদ বলতে কুক কাম বেয়ারা শ্রীমান রঘু।

মিমি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—আপনার খুব কষ্ট তাই না। জানেন অর্ণবদা একটু আগে আমি আপনাকে মিথ্যে কথা বলেছি। আপনি আমার চোখে দুঃখটাকে ঠিকই ধরতে পেরেছেন। আশ্চর্য এই সামান্য একটু সময়ে আপনি কি করে আমার মনের ভেতরটা দেখতে পেয়ে গেলেন। জানেন আমারও মা নেই। বাবা কাজ নিয়ে সব সময়েই ব্যস্ত থাকেন। আই ফিল ভেরি লোনলি এ্যাট টাইমস। মাঝে মাঝে আমার কি রকম একটা কষ্ট হয়। কিন্তু কাউকে তো বলতে পারি না। বললে লোকে হাসবে। আজ এই প্রথম আপনার কাছে বলতে পেরে আমার মনটা খুব হাল্কা লাগছে।

অর্ণব কোন কথা না বলে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল। মিমি আবার বলল —ইটস ফ্যানি আই নো। দেখুন মাত্র দুঘণ্টা আগে আপনার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হল। এখন কেন জানিনা মনে হচ্ছে আপনি আমার কত পরিচিত। কত নির্ভয়ে, কত স্বচ্ছন্দে আমার মনের ব্যথাকে আপনার সামনে প্রকাশ করে দিলাম।

মিমির কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এসেছিল। আর কোন কথা না বলে মিমি চলে গেল।

সেই থেকেই শুরু। দিন ক্ষণ মাস পেরিয়ে ইতিমধ্যে কেটে গেছে দীর্ঘ দশটা বছর।

জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে, ব্যথা-বেদনা, আনন্দে মিমি দিনে দিনে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছে অর্ণবকে। কিন্তু কাছের মানুষ হয়েও অর্ণব মিমির কাছে মনের মানুষ হয়ে উঠেনি। মানুষ বড় বিচিত্র। বিচিত্র মানব মন।

(৩)

অতনু মিত্র গালফ কান্ট্রিতে যাচ্ছেন ছ' সপ্তাহের জন্যে। তাঁর একটা ফার্ম ওখানে পাইপ লাইন ইনসটলেশানের কাজ নিয়েছে। অতনু মিত্র অনেক ভাবনা চিন্তার পর সমর মুখার্জীকে তাঁর গ্রুপ অফ ইণ্ডাসট্রিজের জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্বে বসিয়েছেন। সমর তাঁর বন্ধু-পুত্র। বিলেত থেকে চাটার্ড সেক্রেটারীশিপ আর ম্যানেজমেণ্ট পড়ে এসেছে কয়েক বছর হ'ল। সমর বুদ্ধিমান এবং উচ্চাকাঙ্খী। অতনু মিত্র মনে মনে সমরকে মিমির যোগ্য পাত্র হিসেবে তাঁর কম্পানিতে নিয়ে এসেছেন। অথচ এমন একটা ব্রাইট ইয়ং ম্যানকে মিমি যে কেন পছন্দ করে না অতনু মিত্র ভেবে পান না। অর্ণব তাঁকে হতাশ করেছে। অতনু মিত্র জীবনে হার মানতে জানেন না। তাই অর্ণবের বদলে সমরকে বেছে নিয়েছেন অনেক চিন্তা ভাবনা করে।

মিমি বছর তিনেক হল এম. এ পাশ করে খেয়ালখুশী মত দিন কাটাচ্ছে। কখনও ইনটিরিয়ার ডেকরেশানের ব্যবসা—কখনও কোম্পানী কোম্পানীতে মিল সাপ্লাই—কখনও কেজি. স্কুল—কখনও দর্জির দোকান—নানান কাজে মিমি নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে। অথচ কোন একটাতেই ৩।৪ মাসের বেশী মন সংযোগ করবার বাসনা বা চেষ্টা কোনটাই তার নেই। মিমির নাকি কিছুই ভাল লাগে না।

অতনু মিত্র আজকাল মেয়ের জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়েন। ছেলেবেলা থেকেই নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতে থাকতে মেয়ের সঙ্গে তাঁর একটা বিরাট ব্যবধান

গড়ে উঠেছে। মিমিকে এখন আর তিনি চিনতে পারেন না। বহুবার মিমির সঙ্গে কথাবার্তা বলেও তিনি বুঝতে পারেন নি মিমি আসলে কি চায়। মিমির সঙ্গে অর্ণবের সম্পর্কের ব্যাপারটাও অতনু মিত্র বুঝতে পারেন না। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়েছে অর্ণবের জন্যেই তাঁর মেয়ের এ দুরবস্থা। অথচ অর্ণবের সঙ্গে মিমির বিয়েটাও যে কেন হচ্ছে না তাও তিনি বুঝতে পারেন না।

অর্ণবের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের আগে অতনু মিত্র ভেবেছিলেন পয়সার লোভে অর্ণব মিমিকে বশ করতে চেয়েছে। পরে নানান ঘটনায় তাঁকে তাঁর ধারণাটা পাল্টাতে হয়েছে।

অর্ণবের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর অতনু মিত্র ডায়েরীতে লিখেছিলেন—

"মিমি আজ অর্ণবকে নিয়ে এসেছিল। দুটিকে পাশাপাশি বেশ মানিয়েছিল। আমার মেয়ের স্বামী একজন সাধারণ ঘরের ছেলে হবে এ আমি চিন্তাই করতে পারতাম না। কিন্তু ছেলেটির সঙ্গে কথাবার্তা বলে এবং তার সম্পর্কে মিমির কাছ থেকে শুনে আমার মনে হল, হলই বা অর্ণব সাধারণ ঘরের ছেলে। কিন্তু মনের দিক থেকে তো একটা সাচ্চা হীরে। গড়ে পিঠে নিতে পারলে এর চেয়ে ভালো ছেলে আর পাবো কোথায়। আমি অতনু মিত্র। লোক চরিয়ে খাই। মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না।"

কিন্তু এর পরেও বহুদিন কেটে গেল। অর্ণব মিমি—কেউই তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এল না। অতনু মিত্র হতাশ হলেন। ডায়েরী খুলে তিনি লিখলেন—"মিমি শুনতে পাই অর্ণবের পেছনে পাগলের মত ছুটে বেড়ায়। অথচ অর্ণব নাকি মিমিকে বিয়ে করতে চায় না। নাকি আমিই ভুল খবর পেয়েছি। কিন্তু আমি যে অর্ণবের চোখে ভালোবাসার স্বাক্ষর দেখতে পেয়েছি। তবে…। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে কি রকম গোলমেলে মনে হচ্ছে! প্রকৃত রহস্য আমাকে উদ্‌ঘাটন করতেই হবে। রাজত্ব আর রাজকন্যার লোভ থাকবে না এমন মানুষ পৃথিবীতে আছে নাকি? দেখি…" অতনু মিত্র তাই মনে মনে একটা প্ল্যান করে অর্ণব আর মিমির বিয়ের ব্যাপারে ইতিমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু অর্ণবের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করার পর সব কিছু তাঁর

ওলোট-পালোট হয়ে গেল। সেদিন রাত্রে ডায়েরীর পাতা খুলে অতনু মিত্র আবার লিখলেন—

আজ অর্ণবকে আমার অফিসে ডেকেছিলাম। অর্ণবকে বললাম যে আমার ইচ্ছে তুমি আমার ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে জয়েন কর। তোমার আণ্ডারে দু'জন অভিজ্ঞ টেকনিক্যাল এ্যাডভাইসার থাকবেন। তোমার কোন অসুবিধা হবে না। আপাতত; স্যালারী আর পার্কস্ নিয়ে মাসে তোমায় দশ হাজার টাকা দোব।

অর্ণবের কোন ভাবান্তর ঘটল বলে মনে হল না। শান্তভাবে বলল — একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে মিঃ মিত্র। পৃথিবীতে এত লোক থাকতে আপনি আমাকে বাড়ি থেকে ডেকে এই অবিশ্বাস্য অফারটা দিচ্ছেন কেন?

বললাম—মাই বয়। লোক চিনতে অতনু মিত্র ভুল করে না। তোমায় দেখে এটা অন্তত বোঝবার ক্ষমতা আমার হয়েছে যে তোমাকে যে অফারটা দিচ্ছি তার যোগ্যতা তোমার আছে।

অর্ণব বলল—কিন্তু?

আমি বললাম—কোন কিন্তু নয় অর্ণব। তুমি অহেতুক সঙ্কোচ করছো। আই এ্যাম জাসট লাইক ইওর ফাদার। নেকসট্ উইক থেকেই তুমি কাজে জয়েন কর। আমি আমার চীফ এ্যাকাউনটেণ্টকে বলে রেখেছি যে তোমায় আজ এ্যাডভান্স হিসেব পাঁচ হাজার টাকা ক্যাশ দিয়ে দিতে। তোমার জন্যে নতুন ফ্ল্যাট আর গাড়ি আমি রেডি করে রেখেছি। আর আমার পি, এ, তোমাকে বরকত আলি-তে নিয়ে গিয়ে কয়েক প্রস্থ স্যুট-এর অর্ডার দিয়ে আসবে।

অর্ণবের মুখটা একটু কঠিন হয়ে উঠল। বলল—থ্যাঙ্কস ফর ইওর অফার এণ্ড ম্যাগনানিমিটি মিঃ মিত্র। কিন্তু আমার সম্মতি না পেয়ে আপনার আগে ভাগে এত প্রস্তুতি করে রাখা ঠিক হয়নি।

বিস্ময়ে বললাম—তোমার সম্মতি—মানে! আজকের দিনে এত ভাল অফার কেউ রিফিউজ করে নাকি! ডোণ্ট বি ফুল মাই বয়।

অর্ণব বলল—কিছু মনে করবেন না মিঃ মিত্র। পয়সা আর প্রতিপত্তি আপনার বিচার বুদ্ধি সব ঘুলিয়ে দিয়েছে। আপনার এই অযাচিত দান আমি গ্রহণ করব এ ধারণাটা আপনার ঠিক নয়। কিছু মনে করবেন না আমার চাকরীর জন্যে আপনার কাছে কোনদিন উমেদারী করেছি বলে তো আমার মনে পড়ে না। কাজেই আপনার এ চাকরী গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

জ্বলে উঠলাম আমি। অর্ণবের ঔদ্ধত্যে আমার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। চীৎকার করে বলে উঠলাম—ইউ আর রাইট। ডেসটিনি কেউ পাল্টাতে পারে না। তুমি সারা জীবন কেরানী বা স্কুল মাষ্টারী করবার জন্যেই জন্মেছো। আই এ্যাম এ ফুল। তাই তোমাকে ডেকে চাকরীটা দিতে গিয়েছিলাম।

অর্ণব হেসে বলল—যাক দেরীতে হলেও সত্যটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন তাহলে।

অর্ণবের হাসি আমার মাথায় নতুন করে আগুন জ্বালিয়ে দিল। বললাম—রাস্তার পাঁক থেকে তুলে এনে তোমায় সমাজে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়েছিলাম। সেটাই আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু ভাল করে শুনে রাখ—তুমি যদি ভাব যে দেড়শো টাকার মাইনের একজন সাধারণ লোকের সঙ্গে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দোব দেন ইউ আর লিভিং ইন দি ফুলস প্যারাডাইস। নির্লোভ সেজে আমার মেয়েকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিয়ে করে আমার সম্পত্তিতে ভাগ বসাবে তা আমি হতে দোব না। নাউ ইউ গেট আউট অফ মাই সাইট — ইউ ডার্টি সোয়াইন।

অর্ণব উঠে দরজার কাছে গিয়ে একবার ঘুরে দাঁড়াল। বলল—আপনার মেয়েকে বিয়ে করবার আমার কোন বাসনা নেই। আর আপনার সম্পত্তির ওপরও আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। মিমি আমার বন্ধু—জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধুই বোধ হয়। মিমি আমায় বিয়ে করলে সুখী হবে না সেটা ভেবেই কথাগুলো বললাম। মিমির সুখটাই আমার কাছে সব থেকে বড় কথা। যাক—আপনি বুঝবেন না সে সব। শুধু যাবার সময় একটা কথা

বলে যাই··জীবনে অনেক পয়সা করেছেন—তবে যেটা জীবনের বেসিক জিনিষ—ভদ্রতা—সহনশীলতা, অপরের প্রতি শ্রদ্ধা-বোধ—সেটাই আপনি এখনও শিখে উঠতে পারেননি। আর আপনার যা বয়স তাতে তা আর এখন পারবেন বলে তো আমার মনে হয় না।

আমি উন্মত্ত হয়ে গেলাম। জীবনে আমার সামনে দাঁড়িয়ে এ ভাবে কারুর কথা বলার স্পর্দ্ধা হয়নি। অর্ণবের জামার কলার চেপে ধরে বললাম—ইউ সন অফ এ বীচ। কোনদিন যদি তোমাকে আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় দেখি দেন আই উইল কিল ইউ। আমার মেয়ের সঙ্গে কোন সংস্রব তুমি রাখতে পারবে না। এণ্ড ছাট ইজ মাই লাস্ট ওয়ার্ড।

অর্ণব রাগ করল না। শান্ত স্বরে বলল—আপনার কাছ থেকে এর চেয়ে ভাল সম্বোধন আশা করাটাই ভুল। মিমির কাছ থেকে আমি সরেই যাব ঠিক করেছি—আপনার ভয়ে নয় অবশ্য। তাতে মিমির ভাল হবে বলে। মিমিকে আমি ভালবাসি। আমার জন্যে তার ক্ষতি হোক তা আমি চাই না। আর একটা কথা শুধু বলে যাই—মিমি খুব ভাল মেয়ে। ওকে বুঝতে পারে এমন একজনের সঙ্গে ওর বিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন—নয়ত সি উইল নেভার বি হ্যাপী।

অর্ণব চলে গেল। পরাজয়ের গ্লানিতে আমি মুহ্যমান হয়ে পড়লাম। মিঃ এ, কে, মিটার জীবনে এই দ্বিতীয়বার হেরে গেল। মোহিনীর কথা আজ আবার মনে পড়ল। ব্যথা পেলেই মোহিনীর কথা আমার বড় বেশী করে মনে পড়ে। অথচ অর্ণবকে আমি দুঃখ দিতে··আঘাত করতে চাইনি। মুখের ওপর না শুনতে আমি অভ্যস্ত নই। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ কোন কাজ করলে আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি। আমার আর তখন কোন জ্ঞান থাকে না। আমার মেয়ের সুখ—আমার মেয়ের বাসনাকে অর্ণব এভাবে নষ্ট করে দেবে ভেবে আমি উন্মাদ হয়ে পড়েছিলাম। আমি মিমির পিতা। আমি জানি অর্ণব ছাড়া মিমি সুখী হতে পারে না।

খুব ইচ্ছে করছিল পরের দিন গিয়ে অর্ণবের কাছে মাপ চেয়ে নিই। তার হাত দুটিকে ধরে বলি—তুমি আমার মেয়ের সুখকে ফিরিয়ে দাও।

মিমি আমাকে ভুল বোঝে। কিন্তু আমি তো তাকে সুখী দেখতে চাই। কিন্তু পারলাম না। আমার আভিজাত্য—আমার প্রতিষ্ঠা—আমার গর্ব বারবার আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল। কোথা থেকে কি হয়ে গেল। এতো আমি চাইনি, মোহিনী আমি যে হেরে গেলাম।

কিন্তু আমি অতনু মিত্র। এত সহজে হার স্বীকার করতে রাজী নই আমি। আমাকে জিততেই হবে। আজ থেকে অর্ণবের সঙ্গে আমার পাঞ্জা লড়া শুরু হল। আই উইল ফিনিস হিম। আই উইল সি দি এণ্ড অফ অর্ণব।

নতুন করে প্ল্যান সাজালাম। মিমির মনকে ঘোরাতে হবে। নজর দিলাম সমরের ওপর। সমরকে দাবার গুটি করে জীবনের পাশা খেলায় আমায় জিততেই হবে। মোহিনী তুমি দেখে নিও জয় আমার হবেই।"

এয়ারপোর্টে মিমি এবং সমর অতনু মিত্রকে তুলে দিতে এসেছিলো। সমরকে ডেকে অতনু মিত্র বললেন—মিমি রইলো। আমার অবর্তমানে ওকে ভালো করে দেখা শোনা করবে। বেচারা একদম একা হয়ে থাকবে।

মিমি বাবার যাবার দিনে কোন সিন করতে চাইলো না। চুপ করে রইলো।

(৪)

অর্ণব কদিন হল চাঁদিপুর বেড়াতে এসেছে। কলকাতায় কাজের মাঝে যখন মনটা হাঁপিয়ে ওঠে অর্ণব তখন তার চেনা পরিবেশ থেকে দূরে পালিয়ে চুপচাপ কাটিয়ে আসে কদিন। কলকাতার কাছাকাছি পুরী বা দীঘার চেয়ে চাঁদিপুর অনেক নির্জন।

কলেজ থেকেই মিমি ক্রমেই অর্ণবের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছিল দিনে দিনে। তবে মিমি মিমিই। বিচিত্র এক সমাজের জটিল এক চরিত্র।

দীর্ঘদিনের পরিচয়ে অর্ণবের তাই মনে হয়েছিল। মিমির ভেতর সব সময়ে একটা অশান্ত ঝড়ের দমকা হাওয়া বয়ে চলেছে। এ ঝড়ের দাপটে মিমি নিজেই জানেনা সে কোনদিকে যাচ্ছে। মিমির জন্যে অর্ণব খুব ফিল করে। মিমি আসলে নিজেই জানেনা সে কি চায়।

অর্ণব সমুদ্রের ধারে একটা ঝাউ গাছের ছায়ায় বসে বসে ইতিহাসের একটা বই পড়ছিল। হঠাৎ পেছন থেকে কে তার চোখ টিপে ধরাতে চমকে উঠল অর্ণব। হাত স্পর্শ করে বুঝল মিমি। মিমি ঘনিষ্টভাবে পেছন থেকে অর্ণবকে চোখ টিপে ধরেছিল। মিমির গায়ের চেনা একটা গন্ধ অর্ণব পাচ্ছিল।

এভাবে বিনা নোটিশে অর্ণবের কাছে হানা দেওয়া মিমির খুব একটা নতুন ব্যাপার নয়। তাই অর্ণব বিস্মিত হল না। হাত ছাড়িয়ে বলল—আমার ধারণা ছিল তুমি বাবার সঙ্গে বিদেশে বিজনেস ট্যুরে গেছ। তাছাড়া আমি যে এখানে এসেছি তাতো কাউকে বলে আসিনি। তুমি জানলে কি করে!

মিমি বলল — নিছক টেলিপ্যাথি বলতে পার। অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি—খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল তোমায়। তাই চলে এলাম। তোমাকে আমি সহজে মুক্তি দোব না অর্ণবদা। জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ালে কি হবে আমার হাত থেকে তুমি মুক্তি পাবে কি করে।

অর্ণব বলল—তা না হয় হল—কিন্তু হঠাৎ এ আগমনের হেতু।

মিমি বলল—আগমনের হেতু যদি শুনতে চাও তবে বলি অজ্ঞাতবাস থেকে শ্রীমান অর্ণবকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। মাইণ্ড ইউ ভরতের মত শুধু পাদুকা নিয়ে ফিরতে আমি রাজি নই। আই ওয়াণ্ট অর্ণব বিশ্বাস ইন ফ্লেশ এণ্ড ব্লাড। বাবা বিদেশে গেছেন। আমার দেখার জন্যে রেখে গেছেন সমর মুখার্জিকে। বাবার মনের ভাষায় আমার উড বি হ্যাসব্যাণ্ড। অনেক চেষ্টা করলাম ভাল মেয়ের মত চুপচাপ থাকতে। কিন্তু ঐ আলুভাতে মার্কা ফরমালিটির মোড়কে মোড়া সমর মুখার্জিকে দেখলেই আমার কি রকম গা ঘিন ঘিন করে। তাই পালিয়ে এলাম তোমার কাছে। ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড।

অর্ণব বলল—কিন্তু অজ্ঞাতবাস থেকে আমি যে তোমার সঙ্গে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করব তার নিশ্চয়তা কোথায়!

মিমি নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল—তুমি ভেবো না আমি কোন বিকল্প ব্যবস্থার চিন্তা না করেই এতদূর ছুটে এসেছি। তোমাকে তো চিনি। তাই ইন দি ইভেন্ট অফ ইউর রিফিউস্যাল ঠিক করেছি এখানেই কদিন আমার সাময়িক শিবির স্থাপনা করে তোমায় পরাজয়ের রণকৌশল রচনা করে যাবো। সঙ্গে একটা ওভার নাইট ব্যাগ নিয়ে এসেছি। বাহন তো সঙ্গেই আছে। প্রবাসের কাল বিলম্বিত হবার সম্ভাবনা থাকলে নিকটবর্তী এলাকা থেকে কিছু পরিধেয় বস্ত্র জোগাড় করে নিতে খুব একটা অসুবিধা হবে না।

অর্ণব বলল—কিন্তু থাকবে কোথায়? লজের সব ঘরই তো বুকড।

মিমি বিস্ময়ে বলল—বারে তোমার ঘরটাতো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। তোমার গেষ্ট হয়েই থাকবো না হয় যতদিন না তুমি প্রত্যাবর্তনের একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলছো। বিছানা না থাকলে একটা একস্ট্রা কট আনিয়ে নোব। আর তাও না পাওয়া গেলে মাটিতে শুয়ে কৃচ্ছ্র সাধন করব। শোননি শিবের জন্যে পার্বতীকেও যে তপস্যা করতে হয়েছিল। এটা কিন্তু দারুণ হবে।

অর্ণব কোন কথা বলছেনা দেখে অর্ণবের দিকে চেয়ে মিমি আবার বলল—কিন্তু অর্ণবদা আমি এখানে থাকবো শুনে তোমার চোখে আতঙ্কের ছায়া ফুটে উঠছে কেন!

অর্ণব বলল—আতঙ্কের কোন ব্যাপার নয়। এক ঘরে আমার সঙ্গে তুমি থাকবে সেটা কি ভাল দেখায়। তাছাড়া তোমার বিয়েটা সময় মুখার্জির সঙ্গে প্রায় ফাইন্যাল হয়ে গেছে। তিনি যদি শোনেন তুমি একলা আমার সঙ্গে থাকছো সেটা তোমার পক্ষেই ক্ষতিকারক হবে।

মিমি জ্বলে উঠল। বলল—তুমি যে এত কাওয়ার্ড আমি জানতাম না। আমার বিয়ের জন্যে অযথা তোমার আর মাথা ঘামাতে হবে না। তাছাড়া তুমি বোধহয় জাননা যে আমাদের সমাজে কে কার সঙ্গে রাত কাটাচ্ছে সে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

মিমি কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলো। তারপর খুব শান্ত স্বরে বলল—তুমি আমাকে একদম ভালোবাসো না অর্ণবদা। আমায় তুমি কেন যে বুঝতে পারো না জানি না। এতদূর থেকে তোমার কাছে ছুটে এলাম। আর তুমি উল্টোপাল্টা গাইতে শুরু করলে। আমার বাবা—সমর মুখার্জিই কি বড় কথা—আমি কি তোমার কেউ নই?

এই মিমি। অর্ণব জানে তার সঙ্গে তর্ক করা যায় না। যুক্তি দিয়ে কিছু বোঝান যায় না। মিমি যা ঠিক করবে তা সে করবেই।

মিমি আবার বলল—আজ লং ড্রাইভ করে আমি খুব ক্লান্ত। আজকের দিনটা একটু বিশ্রাম নিতে দাও। তুমি না চাইলে কালই আমি চলে যাব।

অর্ণব হাসল একটু। বলল—পাগলী কোথাকার। আমি কি তোমায় চলে যেতে বলেছি। দাঁড়াও হোটেলে তোমার খাবার কথা বলে আসি।

উল্লাসে হাততালি দিয়ে উঠল মিমি। বলল—দ্যাটস লাইক এ গুড বয়। অর্ণবদা এখন যেও না। আমার ভীষণ ক্লান্তি লাগছে। তোমার কোলে মাথা রেখে একটু শুয়ে থাকি এখানে। জায়গাটা আমার দারুণ লাগছে।

কিছুক্ষণ বাদে আচ্ছন্নের মত মিমি আবার বলল—দীর্ঘ দিনের এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও তুমি যে দূরের সেই দূরের মানুষই রয়ে গেলে অর্ণবদা। আজ এই ঝাউগাছের ছায়ায় নিস্তরঙ্গ নির্জন পরিবেশে তোমার কোলে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে একটু বিশ্রাম নিতে দাও। জান অর্ণবদা—আজকাল আমার আর কিছু ভালো লাগে না।

মিমির জন্যে অর্ণবের খুব কষ্ট হতে লাগলো। পরম স্নেহে তার কোলে শায়িত মিমির মাথায় অর্ণব নীরবে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। মিমি তার জীবনের এক দুরন্ত ঝড়। অর্ণব মিমিকে ভালবাসে। কিন্তু মিমির সুখের জন্যে তার অহেতুক আশঙ্কা দিনে দিনে তাকে মিমির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। মিমির দিকে তাকিয়ে অর্ণব দেখল মিমি পরম নিশ্চিন্তে তার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে।

মিমি রাত্রে তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছিল। ঘুম থেকে উঠলো

বেলা এগারটায়। জায়গাটা মিমির খুব পছন্দ হয়েছিল—তাই ঠিক করেছিল এখানে সে আরো দু-চার দিন থেকে অর্ণবকে জোর করে নিয়ে যাবে। ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিল মিমি। অর্ণব সমুদ্রের ধারে ঝাউগাছের তলায় যথারীতি বসে বসে বই পড়ছিলো। মিমি এসে বলল—অর্ণবদা মড়ার মত ঘুমিয়েছি কাল। তোমার সঙ্গে ভাল করে গল্পও করা হল না। আমার হাতের টাকা ফুরিয়ে গেছে। ট্রাভেলার্স চেক ভাঙাতে বালেশ্বর যাচ্ছি। তোমাকেও সঙ্গে নেবার ইচ্ছে ছিল—কিন্তু তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাতে ইচ্ছে করছে না। তাছাড়া বালেশ্বরে বাবার একটা ছোট অফিস আছে—ওখানে সামান্য কিছু কাজ সেরে আমি বিকেলে ফিরে আসবো। এ বেলা তুমি একলাই খেয়ে নিও।

মিমি তার সঙ্গে নিয়ে আসা একটা তাঁতের শাড়ী পড়েছিল। চুলগুলো খোঁপা করে বাঁধা। মিমিকে আজ ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছিল।

অর্ণব বলল—তোমাকে আজ দারুণ দেখাচ্ছে মিমি। সামনে উথাল-পাতাল সমুদ্র। চারিধারে ঝাউবন—অখণ্ড নির্জনতা। এই বিশাল প্রাকৃতিক ক্যানভাসের মধ্যবিন্দুতে কপালে টিপ, মাথায় খোঁপা—তুমি দাঁড়িয়ে আছো। যেন চিরকালের শাশ্বত এক নারী সমুদ্রের মাঝখান থেকে উঠে এসে আমার সামনে থমকে দাঁড়িয়েছে। আমি যদি শিল্পী হতাম তবে তোমার এই বিশেষ রূপটাকে চিরকালের ক্যানভাসে ধরে রাখবার চেষ্টা করতাম।

আবেশে মিমির চোখ বুঁজে গিয়েছিলো। অর্ণব এভাবে তার রূপের প্রশংসা করেনি কখনো আগে। কিছুক্ষণ বাদে মিমি বলল—তুমি যখন কথাগুলো বলছিলে তখন আমার চোখে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন ভেসে আসছিলো অর্ণবদা। মনে হচ্ছিল আমি যেন আমার আরাধ্য দেবতার কাছে নতজানু হয়ে আশীর্বাদ ভিক্ষা করছি। আর আমার দেবতা পরম স্নেহে আমার মনের সব বেদনাকে ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়ে আমার সব স্বপ্নকে সফল করে দেবার আশীর্বাদ দিচ্ছেন। জান অর্ণবদা জীবনে এই ধরনের ফিলিংস আগে আমার কোনদিন হয়নি। ইট ইজ সামথিং নিউ টু মি। এ নিউ কাইণ্ড অফ রিয়ালাইজেশন।

তারপর গাড়িতে উঠে ষ্টার্ট দিতে দিতে মিমি বলল—তোমাকে আমার

অনেক কথা বলার আছে অর্ণবদা। আমার মনের গাছের মুকুলগুলো ফুল হয়ে এতদিনে ফুটে উঠতে চাইছে, তোমার নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য দিয়ে তা তুমি পিষ্ট করে দিও না।

মিমি চলে গেল।

অর্ণব স্থাণুর মত বসে বসে মিমির কথাগুলো ভাবছিল। অর্ণব মিমিকে জানে। খুব ভাল করেই জানে হয়ত। তাই বুঝতে পারছিল যে এতদিনে যে সমস্যাটাকে সে সযত্নে এড়িয়ে এসেছে তার মুখোমুখি দাঁড়াবার সময় এসে গেছে।

(৫)

মিমি বালেশ্বরে তাদের ব্রাঞ্চ অফিসে এসে পৌঁছে দেখল সমর বসে আছে। সমর যে এখানেও ছুটে আসবে মিমি ভাবেনি। আসার সময় বাড়ির ম্যানেজার সুশোভন বাবুকে বলে এসেছিলো শুধু। সমর মুখার্জি করিৎকর্মা লোক। মনে হয় সুশোভনবাবুর কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করে এখানে চলে এসেছে।

মিমিকে দেখেই সমর হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এসে বললো—দেখতো এভাবে না বলে কয়ে বাড়ি থেকে হুট করে চলে আসে। আই ওয়াজ অফুলি ওয়ারিড। মিঃ মিটার তাঁর অবর্তমানে আমাকে তোমার দেখাশোনার ভার দিয়ে গেছেন। কিছু একটা হয়ে গেলে আমি কি জবাব দিতাম বলতো। সুশোভনবাবুর কাছ থেকে খবর পেয়ে আজ দুদিন হল এখানে এসে বসে আছি সব কাজকর্ম ফেলে।

মিমির কোন ভাবান্তর ঘটল বলে মনে হল না। সমরের কথায় কোন জবাব না দিয়ে তাদের অফিসের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে বলল—আমার সঙ্গে একটু চলুন তো। ট্রাভেলার্স চেকটা ভাঙাতে হবে।

সমর মিমির আচরণে মনে মনে চটে গিয়েছিল। তাহলেও খুব সংযত ভাবে বলল—মিমি আই সেড সামথিং টু ইউ। ইউ স্যুড হ্যাভ এ্যানসারড মি ফার্স্ট

মিমি বলল—সত্যি কত চিন্তা ভাবনায় কলকাতার সুখশয্যা ছেড়ে এই

সুদূর বালেশ্বরে এসে মশার কামড় খাচ্ছো। তোমার প্রতি আমার একটু সফট হওয়া উচিত ছিল। আই এ্যাম সরি।

সমর আহত স্বরে বলল—তুমি সেটা বুঝতে পারলেই ভাল। আমাকে তো তুমি মানুষ বলে ভাবো না। কিন্তু তোমার প্রতি আমার একটা কর্ত্তব্য রয়েছে—সেটা আমি ভুলি কি করে।

মিমি ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে আয়না ধরে ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাতে লাগাতে বলল—রিয়েলি। তা তোমার এত দুশ্চিন্তার কারণ কি? আমাকে খুঁজে না পেলে তোমার চাকরীটাতো চলে যেতো না। মাই ড্যাডি নোজ মি ওয়েল। ফর নাথিং তুমি কষ্ট করে এতদূর এলে। যাহোক দেখতে পাচ্ছো যে আমি বেঁচে রয়েছি এবং কেউ আমায় এ্যাবডাক্ট করে রেপ করে মার্ডার যখন করেনি তখন নিশ্চিন্ত মনে তুমি কলকাতা ফিরে যেতে পারো।

সমর বলল—সেকি। তুমি যাবে না। আমি তো তোমায় নিয়ে যাবো বলে এখানে বসে আছি।

মিমি বলল—তোমার ওপর অভিমান করে যখন আসিনি তখন তোমার সঙ্গে ফিরে যাবার কোন ব্যাপারই থাকতে পারে না। ফর ইওর ইনফরমেশন এণ্ড স্যাটিসফ্যাকশান জেনে যাও যে আমি এখানে বেড়াতে এসেছি এবং আরো দু-চারদিন এখানে থাকবার বাসনা আছে মনে।

সমর তবু বলল—হাউ ক্যান ইউ সে দ্যাট। আমি বলছি যে তোমাকে আমার সঙ্গে ফিরে যেতে হবে।

মিমি জ্বলে উঠল। বলল—হু দি হেল ইউ আর টু অর্ডার মি।

সমর চটল না। বলল—ডোণ্ট বি সিলি মিমি। তোমার বাবা ফিরে এলেই তোমার সঙ্গে আমার এনগেজমেণ্ট এনাউন্স করবেন বলে গেছেন। তুমিও তো তা জান। সুতরাং তুমিই বল তোমাকে ফিরে যেতে বলার আমার কোন অধিকার আছে কি না!

মিমি খুব শান্ত স্বরে বলল—লোককে অহেতুক হার্ট করা আমার স্বভাব নয়। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় বেশী দিনের নয় তাই তুমি আমাকেজাননা বলেই

কথাগুলো বলছো। তুমি বোধহয় জাননা বাবার ইচ্ছের সঙ্গে আমার ইচ্ছের একটা আকাশ পাতাল ফারাক রয়েছে। বাবা বললেই যে আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হব একথা যদি ভেবে থাক তবে তুমি ভুল করেছো।

সমর বিস্মিত হয়ে বলল—মানে।

মিমি বলল—বাবার কাছে নিশ্চয় শুনে থাকবে যে আই এ্যাম ইন লাভ উইথ সামওয়ান এলস। আমি অন্য একজনকে ভালবাসি। কাজেই এক্ষেত্রে তোমাকে বিয়ে করবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু সমর আমি একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে তুমি কেন মিঃ এ কে মিটারের চামচে হয়ে কাটাচ্ছো। তোমার পৈত্রিক সম্পত্তি শুনেছি অনেক। তাছাড়া তুমি লেখাপড়া জানা ভাল ছেলে। তোমার নিজের ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই।

সমর বলল—এভাবে বলছো কেন মিমি। স্ত্রী হিসেবে তোমাকে পেলে আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করব।

মিমি ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর বলল—তুমি কি জান সমর, আজ তুদিন হল আমি সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে একঘরে থাকছি। হোটেলের রেকর্ড দেখলেই বুঝতে পারবে। এণ্ড ইউ ক্যান ইজিলি গেস ছাট উই আর হ্যাভিং এনাফ অফ সেকস টোগেদার।

সমর খুব একটা বিস্মিত হল বলে মনে হল না। বলল—সো হোয়াট। বিয়ের আগে আজকাল মডার্ণ মেয়েদের ওরকম একটু আধটু এ্যাফেয়ার থেকেই থাকে। তার জন্যে আমার কোন চিন্তা নেই। আমি তোমাকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চাই।

মিমি খুব সহজভাবেই বলল—কিন্তু আমি যে তোমাকে স্বামী হিসেবে পছন্দ করি না। তুমি অনর্থক সময় নষ্ট করছো।

সমর বলল—এখন বুঝতে পারছি যে তোমার বাবা ঠিকই বলেন যে অর্ণব তোমাকে সম্মোহন করেছে। তোমাকে কব্জা করে তার আসল উদ্দেশ্য তোমার বাবার সম্পত্তি অধিকার করা।

মিমি উচ্চস্বরে হেসে উঠল। বলল—সাধে কি আর তোমায় এ কে

মিটারের চামচে বলি। আচ্ছা এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি মিটার গ্রুপ অফ ইণ্ডাষ্ট্রীজের জেনারেল ম্যানেজারের কাজ চালাচ্ছো কি করে।

সমর চটে গেল। বলল—সত্যি কথাটা অনেক সময় শুনতে ভালো লাগে না ঠিকই। তবে সত্যি সব সময়েই সত্যি—তা তুমি স্বীকার কর বা না কর।

মিমি বলল—পরের মুখে ঝাল খেলে জীবন থেকে সত্য উপলব্ধি করা যায় না। অর্ণবকে তুমি জান না তাই তার বিচার করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। দুঃখ লাগে আমার হোলি ফাদারের কথা ভেবে। এত বিচক্ষণ লোক হয়েও বাবা অর্ণবকে চিনতে পারলো না।

সমর আবার বলল—সে যাইহোক, আমি তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি। এণ্ড ইউ আর গোয়িং উইথ মি।

মিমি বলল—কাউকে দুঃখ দিতে আমার ভাল লাগে না। কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট করে তোমায় জানিয়ে রাখি যে আমাকে বিয়ে করার আশা তুমি ত্যাগ কর। আমি তোমায় বিয়ে করব না।

সমর বলল—কারণটা জানতে পারি কি?

মিমি বলল—কারণটা আর নাই বা শুনলে।

সমর তবু বলল—কারণটা আমাকে জানতেই হবে। পাত্র হিসেবে আমার অযোগ্যতাটা কোথায়!

মিমি বলল—তুমি অযোগ্য তাতো বলিনি। শুধু বলেছি যে তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই না। তুমি একটা আশা নিয়ে থাকবে সেটা ভাবতে আমার ভাল লাগে না। ইউ আর এ ওয়েলদি ইয়ং ম্যান—জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছো—অনেক ভালো মেয়েই তুমি পাবে।

সমর আবার বলল—কিন্তু আমাকে অপছন্দ করার কারণটা তোমাকে বলতেই হবে। আর তা না শুনে আমি এখান থেকে যাব না।

মিমি ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল—কারণ আমি তোমায় ঘৃণা করি। আই

হেট ইউ ক্রম দি ভেরী কোর অফ মাই হার্ট। আমি জানি না কেন—বাট ইটস ট্রু। আই কানট হেলপ ইট।

সমরের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সমর কোন কথা বলতে পারছিল না।

মিমি নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে সমরের কাঁধে আলতো করে একটা হাত রাখলো। বলল—সমর প্লিজ ফরগিভ মি। আমি তোমাকে ইচ্ছে করে আঘাত করতে চাইনি। বার বার তুমি কেন আমাকে খোঁচা দিয়ে আমার মনের ভেতরটা বাইরে বার করে আনলে। তোমার প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই—কিন্তু কেন জানিনা তোমাকে আমি কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছি না। আঘাত দিয়েছি বলে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমাকে ভুল বুঝো না। আমার ফিলিংসগুলো তোমাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না।

সমর কোন কথা বলল না। মিমি আবার বলল—তোমাকে আঘাত দিয়েছি বলে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। বানিয়ে আমি মিথ্যে কথা বলতে পারি না। তোমার সম্পর্কে আমার কোন ইল ফিলিং নেই—কথাটা যদি বিশ্বাস কর তবে আমার ভালো লাগবে। এ বেলা টাউনে আছি। আমি তোমাকে লাঞ্চ খাওয়াতে চাই। যদি রাজী হও তবে বুঝবো তুমি আমায় ক্ষমা করেছো।

সমর না বলল না। যেতে যেতে শুধু বলল—মিমি সত্যি কথা সব সময়ে বলাটা ঠিক নয়।

মিমির চোখে জল এসে গিয়েছিলো। বলল—আমি কি করব বল! আমার মনের ভেতরটা যদি তোমাকে দেখাতে পারতাম তবে তুমি আমায় ভুল বুঝতে না। আই এ্যাম সরি সমর। অফুলি সরি।

(৬)

মিমি চাঁদিপুরে ফিরে এল সন্ধ্যা নাগাদ। মিমিকে এবেলা একটু গম্ভীর দেখাচ্ছিল। সকালের সেই হাসিখুশী উচ্ছল ভাবটা আর দেখা যাচ্ছিল না। অর্ণব তা লক্ষ্য করেছিল। তাই বলল—ম্যাডামকে কিরকম যেন গম্ভীর দেখাচ্ছে? ঝগড়া করে এসেছ নাকি কারুর সঙ্গে।

মিমি বলল—আর বোলো না। শহরে গিয়ে দেখি সমর আমাদের ব্রাঞ্চ অফিসে এসে বসে আছে। আমাকে কলকাতা নিয়ে যাবে বলে।

অর্ণব বলল—ভাবী স্বামী হিসেবে সে তার যোগ্য কাজই করেছে। তোমার উচিত ছিল ওর সঙ্গে চলে যাওয়া।

মিমি বলল—বেচারীকে খামোখা অপমান করলাম। ওর তো কোন দোষ নেই। বাপী ওকে নাচাচ্ছে। ও বেচারা সব কিছু না জেনেই সেই তালে নাচছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মিমি আবার বলল—আমার যে মাঝে মাঝে কি হয়ে যায় আমি নিজেই বুঝতে পারি না। আমি নিজের ওপর কণ্ট্রোল হারিয়ে ফেলি। মনে যা আসে তাই বলে ফেলি। সমরকে পরিষ্কার বলে দিয়েছি আমাকে বিয়ে করার আশা তুমি ত্যাগ কর। আচ্ছা তুমি বলতে পার কেন মাঝে মাঝে আমার এমন হয়ে যায়।

অর্ণব বলল — আমার মনে হয় তোমার মনের ভেতর নিজের গড়া একটা নিজস্ব ভুবন রয়েছে। তোমার পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সে জগতের কোন মিল নেই। আর বিপরীতমুখী সেই দুটো জগতকে তুমি যতই এক করে মেলাতে যাচ্ছো—তারা ততই বেশী আলাদা হয়ে যাচ্ছে। তাই তোমার মনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

মিমি বলল—জ্ঞান হবার পর আমি আমার মাকে পাইনি। বাপী বলেন যে আমার জন্মের পরই নাকি মা মারা যান। বাট আই ডাউট ইট। মার ব্যাপারে আমার মন বলছে একটা রহস্য রয়ে গেছে। সাম মিষ্ট্রি।

অর্ণব বলল—সত্যিই যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা নিয়ে এতদিন বাদে তোমার চিন্তা করাটা ঠিক নয় মিমি। অতীতের কবর খুঁড়ে বর্তমানের যোগফলে গড়মিল ঘটিয়ে লাভ কি বল?

মিমি বলল—বাট আই মাষ্ট নো দি ট্রুথ। আর যতক্ষণ তা না জানছি ততক্ষণ আমার মাথার আগুন নিভবে না। অর্ণবদা, তুমি বুঝবে কি করে যে সামান্য একটু ভালবাসা—একটুখানি মমতার জন্যে প্রাণটা আমার বার বার ছটফট করে মরেছে। বাট মাই বাপি—দিনের পর দিন আমার

কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছে। বাপীর বোধহয় ধারণা যে জীবনে পয়সা আর স্বাচ্ছন্দ্যই সব।

অর্ণব ব্যথা পেল মনে। বলল—এবার বিয়েটা তুমি করে ফেল। ইউ নীড কম্পানি। তার কাছে তুমি এতদিন যা চেয়ে আসছো সব পেয়ে যাবে। তোমার মাঝে পূর্ণতা আসবে।

মিমি আবেগের সঙ্গে বলল—দ্যাটস রাইট। আমি বাঁচতে চাই অর্ণবদা। আই ওয়ান্ট টু লিভ লাইক এ ফুল ফ্লেজেড উওম্যান। সমর মুখার্জিরা আমার মনের আসল চেহারাটা কোনদিন উপলব্ধি করতে পারবে না। আই ওয়ান্ট এ রিয়েল সিমপ্যাথেটিক ম্যান—যে আমার কমপ্লেক্স চরিত্রটা বুঝতে পারবে।

অর্ণব কোন জবাব দিল না।

মিমি উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল—চুপ করে থেকো না অর্ণবদা। আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাসো। এণ্ড ইউ নো ইট মোর দ্যান মাইসেলফ দ্যাট আই টু লাভ ইউ—লাভ ইউ ফ্রম দি ভেরী কোর অফ মাই হার্ট। তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে থেকো না। ইউ মাস্ট হেল্প মি। তাই ভিখিরীর মত ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে তোমার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি। ইউ আর মাই ডেসটিনি।

উত্তেজনায় মিমির চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। অধীর আগ্রহে মিমি অর্ণবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। অর্ণব কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

মিমি ক্ষেপে গেল। অর্ণবের নত মুখটাকে ধরে উঁচু করে দিয়ে বলল—দ্যাট মীনস ইউ ডোণ্ট ওয়ান্ট ইট। বাট হোয়াই? হোয়াই ডোণ্ট ইউ স্পীক আউট।

অর্ণব ধীরে ধীরে বলল—তুমি আজ খুব উত্তেজিত। এখন নয়। পরে এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলব।

মিমি বলল—তোমাকে এই মুহূর্তেই বলতে হবে। কিসের তোমার আপত্তি। জান আমাকে বিয়ে করবার জন্যে কত লোক পাগল হয়ে আমার পেছু পেছু ছুটেছে। আই ডিডন কেয়ার। আই রিফিউজড অল অফ দেম—

ফর ইউ। অর্ণবকে ধরে পাগলের মত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে মিমি বলল—কেবল তোমার জন্যে—ফর ইউ অনলি ইউ নো। তোমাকে মন থেকে আমি কিছুতেই সরাতে পারছি না।

অর্ণব বোবা স্তব্ধতায় চুপ করে রইলো।

মিমি উত্তেজিত হয়ে কিছুক্ষণ ঘরময় পায়চারী করতে লাগল। তারপর অর্ণবের সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল। বলল—তোমাকে আজ বলতেই হবে কেন আমাকে ভালবেসেও তুমি বিয়ে করতে চাও না। কি নেই আমার। রূপ, যৌবন, শিক্ষা, সংস্কৃতি কোনটার অভাব আমার। আমার ভালবাসাকে এভাবে তুমি অপমান করতে পার না। ইউ কাণ্ট।

মিমি উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছিল। তারপর অস্ফুট স্বরে অর্ণবের সামনে দাঁড়িয়ে বলল—একবার ভালো করে চেয়ে দেখ অর্ণবদা আমার দিকে। আমার সারা দেহে ভরন্ত যৌবন—নিবেদনের আশায় উন্মুখ হয়ে রয়েছে। বুকভরা ভালবাসার ডালি নিয়ে আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

মিমি তারপর খুব শান্তভাবে আস্তে আস্তে দেহের সমস্ত আবরণ উন্মোচন করে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়াল অর্ণবের সামনে।

সমুদ্র তীরের নির্জন আবাসে ঘরের জানলা দিয়ে এক রাশ পূর্ণিমার নরম আলো এসে পড়েছে। লজের বাগান থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি ফুলের গন্ধ। নিস্তব্ধ নির্জনতা ভেদ করে কানে আসছে সাগর তীরে আছড়ে পড়া জলের শব্দ। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে মিমি—ফুটন্ত তাজা এক গোছা গোলাপ। অর্ণব মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইলো উত্তাল মিমির দিকে।

তিরিশের ধারে এসেও মিমির দেহের যৌবনের বাঁধুনী এতটুকুও শিথিল হয় নি। মেদহীন সুগঠিত দেহে বর্ষার ভরা নদীর ঢল। সুপুষ্ট উন্নত স্তনযুগল। ভারী নিতম্ব, ছন্দোময় বাহু যুগল। যেন কোন দক্ষ শিল্পীর হাতে গড়া শ্বেত পাথরের এক প্রাণময় মূর্তি—যুগ যুগান্তরের বেদনা বহন করে শাপ মোচনের পর তার প্রিয়তমের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবার আশায় উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

মিমি ধীর পায়ে এগিয়ে এল অর্ণবের কাছে। বলল—তোমার মনে যদি শিল্প চেতনা থাকে তবে তুচোখ ভরে দেখে বল কোথায় আমার অপূর্ণতা। হতবাক অর্ণবের হাত তুটি টেনে নিয়ে নিজের উন্মুক্ত ভরাট তুই স্তনের ওপর রাখলো মিমি। তারপর বলল — জীবনে এই প্রথম আমার এই দেহকে তোমার সামনে উৎসর্গ করে দিলাম। তুমি একে গ্রহণ কর। মিমি পাগলের মত অর্ণবকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে তার ঠোটে, মুখে—সারা দেহে চুমু খেয়ে যেতে লাগলো।

নগ্ন পূর্ণ যৌবনা যুবতী নারীর ঘনিষ্ঠ চুম্বন, আলিঙ্গন আর নিষ্পেষণে অর্ণবের রক্তে আগুন ধরে যাচ্ছিল। সারা শরীরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল তার। মিমি তাকে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরেছে শক্ত করে। মিমির স্তনের উষ্ণ উত্তাপ, শরীরের কোমল পেলবতা—পরিপক্ক ওষ্ঠের নিবিড় চুম্বন অর্ণবকে পাগল করে দিতে চাইছিলো।

কিন্তু সব কিছুর মাঝেও একটা কঠিন সংযমবোধে অর্ণব নিজেকে সংযত করে রাখবার চেষ্টা করছিল। নিজের পরাজিত রিপুর সঙ্গে সংগ্রাম করে চলছিল প্রাণপণে। অনেক কষ্টে মিমির বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে উঠে বসল অর্ণব। বলল—মিমি প্লিজ, একটু শান্ত হও। কাম টু ইউর সেন্স। আমার সঙ্গে নিজেকে এভাবে জড়িয়ে তুমি নিজেই তুঃখ পাবে বেশী। লক্ষ্মীটি উঠে বস। আই ওয়াণ্ট টু টক টু ইউ।

আর মিমি উন্মত্তের মত অর্ণবকে কিল, ঘুঁষি, চড় মারতে মারতে বলতে লাগল—ইউ সন অফ এ বীচ। হাউ ডেয়ার ইউ টু রিফিউজ মী। আই উইল কিল ইউ বাসটার্ড। আই হেট ইউ—হেট ইউ। আমি তোমাকে ঘৃণা করি।

অর্ণব কিছু বলল না। কিছুক্ষণ বাদে বিছানার ওপর উঠে বসে অর্ণবকে তু'হাতে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো মিমি।

অর্ণব ভাবল কাঁদুক। না কাঁদলে মিমির মনের ভার লাঘব হবে না—শান্ত হতে পারবে না। মিমির জন্যে এক নিষ্ফল বেদনায় অর্ণব কাতর হয়ে পড়ছিল। অর্ণব ভেবে পাচ্ছিল না সে কি করবে। মিমিকে সে

যে ভালবাসে না তা নয়। বরং গভীর ভাবেই ভালবাসে। কিন্তু একটা বিচিত্র মানসিকতার পীড়ণে—একটা অদ্ভুত জীবনবোধের ভ্রান্ত ধারণায় তার মনে হয়েছিল যে তার সঙ্গে বিয়ে হলে মিমিকে সে সুখী করতে পারবে না। অর্ণবের ধারণা হয়েছিল সময় এবং অবস্থার পরিবর্তনে সবই একদিন হয়ত ঠিক হয়ে যাবে। তাছাড়া সবচেয়ে যেটা বড় কথা তা অর্ণব বহু চেষ্টা করেও তার অতীতটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিল না। বার বার তার তাই মনে হচ্ছিল মনের এই অবস্থায় মিমিকে বিয়ে করলে তার প্রতি সে অবিচার করবে।

মিমির সঙ্গে পরিচয়ের আগেই অপর এক নারী অর্ণবের জীবনের গভীরে বিরাট এক মহীরুহের শিকড়ের মত অষ্টেপৃষ্ঠে সর্বদিক থেকে তাকে মরণ বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে। শত চেষ্টা করেও সে বন্ধন থেকে অর্ণব মুক্তি পায়নি।

সীমারা তাদের বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে এসেছিল। অর্ণবের মা জীবিত থাকাকালীন এ বাড়িতে সীমার অবাধ গতায়াতের মাধ্যমে কখন যে অর্ণব তাকে ভালবেসে ফেলেছিল তা বুঝতে পারেনি। মনের গোপনে ভালবাসার বীজ দুজনের মনেই মুকুল ধরিয়েছিল—কিন্তু ফুল আর ফুটল না। এদিকে সীমা অজান্তেই ধীরে ধীরে অর্ণবের প্রাণের নিশ্বাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। যখন অর্ণব তা বুঝল তখন আর কিছু করার নেই।

অর্ণব একথা বলেনি কোনদিন মিমিকে। ভাবলো আজ তাকে বলতেই হবে। নয়ত মিমি তাকে ভুল বুঝবে—ভাববে সে মিমিকে অন্যায়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। মিমিকে সে দুঃখ দিতে চায় না। মিমি তার জীবনের নিঃশ্বাস। কিন্তু সীমা তার হৃদপিণ্ড। সে স্তব্ধ হলে জীবনের নিঃশ্বাসও যে ফুরিয়ে যাবে।

মিমি কিছুক্ষণ বাদে বলল—আমি আজই চলে যাব।

অর্ণব শান্তভাবে বলল—রাত্রে অচেনা জায়গায় ড্রাইভ করে একলা তোমার যাওয়াটা ঠিক হবে না। আজ রাতটা থাকো। কাল সকালে আমিও তোমার সঙ্গে ফিরে যাব।

মিমি কোন কথা বলল না। একটু বাদে অর্ণব মিমির সামনে এসে

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল। বলল—তোমার কাছ থেকে বহুদিন একটা কথা গোপন করে এসেছি আমি। জানি অন্যায় করেছি। কিন্তু ভেবেছিলাম আমি আমার মনটাকে তৈরি করে আমার অতীতটাকে কবর দিয়ে তোমাকে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠবো। কিন্তু পারছি না মিমি। এত চেষ্টা করেও আমি পারছি না। সীমার কাছে আমি বারবার হেরে যাচ্ছি।

মিমি মনে মনে একটু চঞ্চল হল। মুখে বলল—হু দি হেল সি ইজ?

অর্ণব বলল—তোমাকে সব কিছু বলব বলেই আমি আজ প্রস্তুত হয়েছি। নয়ত তুমি যে আমাকে ভুল বুঝবে মিমি। তোমার সঙ্গে পরিচয়ের অনেক আগেই সীমাকে আমি ভালবাসতাম। সীমাও আমাকে ভালবাসতো। দিন যাচ্ছিল। কলেজ ইউনিয়ন, বন্ধু-বান্ধব এটা-ওটা নিয়ে মেতে থাকতাম। সীমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের পরিণতি নিয়ে আমি এতই নিশ্চিন্ত ছিলাম যে সেটা যে কোনদিন একটা সমস্যায় দাঁড়াবে তা ভাবতে পারিনি। মা বেঁচে থাকলে হয়ত তা হত না। কিন্তু হঠাৎ স্ট্রোকে মা মারা গেলেন। মা মারা যাবার তিন চার মাসের মধ্যেই সীমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। খবরটা যেদিন শুনলাম সেদিন একটা সব হারানোর যন্ত্রণা আমার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে আমায় বিবশ করে দিল। সীমা যে আমার মনের সবটুকু জায়গা দখল করে বসে আছে সেদিন তা ভাল করে উপলব্ধি করলাম। সীমা ছাড়া আমার আলাদা অস্তিত্ব আমি ভাবতেই পারছিলাম না। সেদিন প্রথম সীমাকে আমি স্পষ্ট করে জানালাম আমার মনের কথা।

তারপর সেই চির পরিচিত গল্প। সীমা শুনল। শোনার পর পুরোটা দিন চোখের জল ফেললো। তখন অবশ্য কারুর তরফ থেকেই কোন কিছু করাটা খুব শোভন হোত না। অন্ততঃ আমার তাই মনে হচ্ছিল। সীমা নারী। বুদ্ধিমতী। তাই অযথা মানসিক বিলাসকে প্রশ্রয় না দিয়ে যথারীতি গিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসল।

সীমা বলেছিলো—তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা চিরকালীন। আমার মনের গভীরে চিরকাল তোমার জন্যে একটা বিশেষ জায়গা থেকে যাবে। কিন্তু তা তো আর হল না। আমি ভাগ্য বিশ্বাস করি মিমি। আমার দুর্ভাগ্য না হলে দুজনে দুজনকে ভালবেসেও আলাদা হয়ে গেলাম কি ভাবে। আমি সীমাকে

ভালবাসি এ কথাটা স্পষ্ট করে বলার পর থেকে বিয়ের পর স্বাভাবিক কারণেই সীমা আমার সঙ্গে একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতে লাগলো। সে তো নারী। সাবধানী তো একটু হবেই।

আমার চেতনার আলোকে ততদিনে বুঝতে পেরেছি যে সীমা কি প্রচণ্ড প্রভাব আমার জীবনে রেখে গেছে। সীমা পরস্ত্রী। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না কিন্তু পরস্ত্রী সীমাকে আমি পর বলে মনে করতে পারতাম না। মনের গভীরে তাকে আমি ততদিনে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ফেলেছি।

অর্ণব মিমির কাঁধে সস্নেহে একটা হাত রেখে আবার বলল—মিমি, আমার জীবনের সব কিছু হারিয়ে গেছে। সীমা আমার জীবনের সুখকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। আমি ফুরিয়ে গেছি। তোমাকে দেবার মত আমার মনের কোন ঐশ্বর্য আর বাকী নেই। তোমাকে ঠকাতে চাইনা আমি। সীমা দূরে সরে গেলেও—সি হ্যাজ বিকাম এ পার্ট এণ্ড পার্শেল অফ মাই লাইফ। এক সর্বনাশা ভালবাসায় আমার সব কিছু হারিয়ে গেছে মিমি। সীমাকে আমি ভুলতে পারব না বোধহয়। বাট আই উইল ট্রাই। আমি চেষ্টা করব মিমি।

মিমি কোন কথা বলল না।

পরদিন সকালে মিমিকে নিয়ে অর্ণব কলকাতা চলে এল।

(৭)

মিমি কলকাতা থেকে ফিরে দেখল অতনু মিত্র বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন।

খাবার টেবিলে খেতে খেতে অতনু মিত্র মিমিকে বললেন—তাহলে অর্ণবই তোমার জীবনের লাষ্ট ওয়ার্ড।

আক্রমণ যে এদিক দিয়েই আসবে বুঝতে পেরে মিমি নিজেকে প্রস্তুত করেই রেখেছিল। তাই বলল—অর্ণবের ভূত আজও তোমার মাথা থেকে নামল না

বাপী, অনর্থক তুমি আর তোমার জেনারেল ম্যানেজার সময় মুখার্জি অর্ণবের ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে সময় নষ্ট করে যাচ্ছো।

অতনু মিত্র চটে গেলেন। বললেন—এভাবে তুমি আসল কথা এড়িয়ে গেলে চলবে কেন? সময়কে আমি একরকম কথা দিয়ে ফেলেছিলাম। তা তুমি যখন চাওনা—তখন জোর করতে যাব কেন!

মিমি বলল—মেয়ে বড় হলে তার মতামত নেবার একটা প্রয়োজনীয়তা থাকে। তাছাড়া বাপী—তুমি ভেবে দেখো তো বাবা হিসেবে তুমি কি কোন দিন ভাল করে ভেবে দেখেছো আমি কি চাই—কিসে আমার সুখ।

অতনু মিত্র আবার বললেন—এতে তোমার ভাল হবে ভেবেই আমি এটা ঠিক করেছিলাম। আমি তোমার মঙ্গল চাই—আই ওয়াণ্ট টু সি ইউ হ্যাপি।

মিমি বলল—সারা জীবন ধরে কেবল পয়সার পেছনে ছুটে বেড়ালে বাপি। আমি তোমার একমাত্র মেয়ে। কিসে আমার মঙ্গল হতে পারে—কিসে আমি সুখী হতে পারি একবার তা জিজ্ঞেস করেছো কোনদিন আমাকে। তুমি এটা কি করে ভাবছো যে কোন একজনের সঙ্গে বিয়ে দিলেই আমি সুখী হতে পারব।

অতনু মিত্র কোন জবাব দিলেন না। হঠাৎ মিমি বলল—বহুবার জিজ্ঞেস করেও তোমার কাছে সঠিক উত্তর পাইনি। আজ তোমাকে বলতেই হবে আমার মার কথা। আমি বিশ্বাস করি না আমার মা মারা গেছেন। আমার মন বলছে আমার মা বেঁচে আছে। কি হয়েছে তার তোমাকে আজ বলতেই হবে।

অতনু মিত্রের মুখের কোন ভাবান্তর ঘটল না। সহজ ভাবেই জবাব দিলেন—বহুবার তো তোমাকে বলেছি, সি ইজ ডেড। তোমার জন্মাবার কিছুদিন বাদেই তোমার মা মারা যান। এণ্ড দ্যাট ইজ অল এবাউট হার।

মিমি খুব শান্ত স্বরে বলল—বাট ইউ নো ইট ইজ নট ট্রু।

চমকে উঠলেন অতনু মিত্র। অতনু মিত্র খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন। বললেন—যা সত্যি তাই তোমাকে বলেছি। আমি উঠলাম—আমার মিটিং এর দেরী হয়ে যাচ্ছে।

সেই রাত্রে অতমু মিত্র বহুদিন বাদে আবার ডায়েরীর পাতা খুলে লিখলেন—

মোহিনী জান—আজ তোমার কথা আবার জানতে চাইলো মিমি। কি করে আমি তাকে বলি তুমি আজ বদ্ধ উন্মাদ হয়ে রাঁচির পাগলা গারদে বসে মৃত্যুর প্রহর গুনে চলেছো। আমাকে দেখলেও চিনতে পারো না।

মিমি সত্য জানতে চায়। ঘটনাচক্রে একটা অঘটন ঘটে গিয়েছিল। তার জন্যে তুমি বা আমি কেউই তো দোষী ছিলাম না। কিন্তু সে যে বড় নির্মম সত্যি। মিমি তা কি সহ্য করতে পারবে।

আমাদের বিয়ের সেই মিষ্টি তিনটি বছরের নানান ঘটনা এখনও সুখানুভূতিতে আমার চোখ সজল করে তোলে।

কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল! লণ্ডনে বসে তোমার চিঠিটা যখন পেলাম তখন তার মর্ম উপলব্ধি করতেই আমার পুরো একটা দিন কেটে গিয়েছিলো। মিহির যে একাজ করতে পারে তা আমি ভাবতে পারিনি। মিহির আমার মামাত ভাই—একই বংশের ছেলে। সে মদ্যপ এবং দুশ্চরিত্র একথা জানতাম কিন্তু সে যে ঘরের দিকে হাত বাড়াবে তা কল্পনাও করতে পারিনি। মানুষ অমানুষ হয়ে গেলে বোধহয় সবই করতে পারে।

মিহির পরে বোধহয় অনুতপ্ত হয়েছিল কৃত কর্মের জন্যে। লিভারের সিরোসিসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবার আগে আমার কাছে সবই অকপটে স্বীকার করে গেছে। আমি ভাবতে পারিনি আমার মামাত ভাই মিহির বোম্বাইতে আমার হঠাৎ আসার মিথ্যে খবর দিয়ে তোমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাকে রিসিভ করবার জন্যে নিয়ে যাবে। আমাকে দেখবার জন্যে তুমি উদগ্রীব হয়েছিলে। তাছাড়া মিহির তোমার সঙ্গে যে প্রতারণা করবে তাই বা তুমি ভাববে কি করে। তুমি তো তাকে ভালো করে জানতে না। বোম্বাইতে নিয়ে এসে পর পর তিনটে দিন পশুটা অসহায় তোমার দেহের ওপর জোর করে তার পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। তার ফলশ্রুতিতে মিমি এল।

তুমি তো সবই লিখেছিলে মোহিনী। আমি জানি তোমার পক্ষে ঐ অবস্থায় আর কিছু করার ছিল না।

যখন দেশে ফিরলাম তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। মিমি তখন তিন মাস তোমার জঠরে পৃথিবীর আলো দেখবার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফিরে দেখলাম তোমার মাথার দোষ দেখা দিয়েছে। জানাজানি হলে পাছে তোমার বদনাম হয় তাই আবার তোমাকে নিয়ে বিদেশে চলে গেলাম। অনেক চিকিৎসা করেও কোন ফল পাওয়া গেল না। চিকিৎসকরা বললেন—একিউট মেণ্টাল শকে তোমার মানসিক ভারসাম্য একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এ থেকে তোমাকে আরোগ্য করা তাদের সাধ্যের অতীত।

বিদেশে এই অবস্থায় জন্ম নিল মিমি। ফুলের মত পবিত্র এক দেব শিশু। মুখে তার স্বর্গীয় সুষমা। তুমি তখন প্রায় বদ্ধ উন্মাদ। দুহাতে কোলে তুলে নিলাম সেই পবিত্র শিশুকে। সেই থেকে মিমি আমার মেয়ে। তোমার মেয়ে কি আমার মেয়ে নয় মোহিনী। তার জন্মের জন্যে তার তো কোন দোষ নেই। তুমি আজ মানুষ চিনতে পারলে দেখতে আর একটা মোহিনী ঘুরে ফিরে আমার ঘরে আবার ফিরে এসেছে। সেই মুখ—সেই চোখ—দাঁড়াবার সেই দৃপ্ত ভঙ্গী—অবিকল তুমি।

তুমি আমায় বলে দাও মোহিনী—এখন আমি কি করব। কি করে মিমিকে জানাব সব। সে কি সহ্য করতে পারবে।

আজ তোমাকে শপথ করে বলছি মোহিনী—আগামী সপ্তাহে চার মাসের জন্যে আবার আমি বাইরে যাচ্ছি। ফিরে এসে যদি দেখি মিমি অর্ণবের সঙ্গে একটা ফয়সালা না করে ফেলেছে তবে আমার সব সঙ্কোচ আর আভিজাত্য বোধকে ঘুচিয়ে দিয়ে অর্ণবের কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে আমি আমার মেয়ের সুখকে তার কাছ থেকে চেয়ে নোব। মিমিকে তুমি যে আমার হাতে দিয়ে গেছো মোহিনী। সে সুখী না হলে জীবনে দ্বিতীয়বার আমি যে হেরে যাব। তুমি দেখো মোহিনী আমি তা হতে দোব না।

(৮)

চাঁদিপুরের পর দীর্ঘ তিন চার মাস মিমির সঙ্গে অর্ণবের দেখা হয়নি। দু'একবার বাড়িতে ফোন করে জেনেছিল মিমি সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে

যায়—ফেরে গভীর রাত্রে। কোন কোনদিন আবার ফেরেও না। মিমি কলকাতা থাকলে এতদিন তার সঙ্গে দেখা না করে থাকে না। অর্ণব খুব চিন্তিত হয়ে উঠছিল মিমির জন্যে। সেদিনের ঘটনার পর বার বার অর্ণব মনে মনে ভেবেছে যে সে একটা মস্ত ভুল করেছে। মিমিকে তার উপেক্ষা করা ঠিক হয়নি।

অর্ণব একরকম ঠিকই করে ফেলেছিল যে একটা মিথ্যে অতীতকে অযথা জিইয়ে রেখে তার কোন লাভ নেই। সে নিজে তো জীবনে কোনদিন সুখী হতে পারবেই না বরং মিমিকে অহেতুক আবার এক নতুন সংকটের আবর্তে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। অর্ণব মনে মনে খুব অশান্তি ভোগ করছিল। তাই ঠিকই করেছিল যে একদিন মিমির কাছে গিয়ে নিজে থেকে বিয়ের প্রস্তাব রাখবে। কিন্তু মিমিরই যে পাত্তা নেই।

বাড়ির সামনে গাড়ি থামার শব্দে অর্ণব উৎফুল্ল হল। ভাবলো মিমি এসেছে। মিমি তার সঙ্গে এতদিন দেখা না করে থেকেছে বলে মনে মনে তার হঠাৎ খুব অভিমান হতে লাগলো। কিন্তু না মিমি নয়। দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন অতনু মিত্র। মিঃ এ, কে, মিটার।

অতনু মিত্র এভাবে অযাচিত ভাবে তার বাড়ি আসবে অর্ণব ভাবতে পারেনি। মনে মনে তাই বিস্মিত হয়েছিল খুব। তবু ভদ্রতা বজায় রেখে বলল—আপনি? হঠাৎ এভাবে আমার বাড়িতে।

অতনু মিত্রকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার ভারে ভেতর ভেতর তিনি ভেঙে পড়েছেন। মুখে চোখে সুস্পষ্ট উৎকণ্ঠার ছাপ। অতনু মিত্র বললেন—আমায় এভাবে দেখে তুমি হয়ত খুব চমকে গেছো। কিন্তু তোমার কাছে না এসে আর পারলাম না। এক গ্লাস জল খাওয়াতে পার আগে।

অর্ণব কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে দিল অতনু মিত্রকে। জল খেয়ে অতনু মিত্র একটু তৃপ্তি পেলেন মনে হল। বললেন—কি ভাবে সুরু করব ভেবে পাচ্ছি না। তোমার কাছে নিজেই যখন এসেছি তখন বুঝতেই পারছো খুব প্রয়োজন না হলে আমি আসতাম না।

অর্ণব কোন কথা বলল না।

অতনু মিত্র আবার বললেন—অর্ণব তোমাকে আমি অসম্মান করেছি, আঘাত দিয়েছি—সবই আমার মিমির ভালোর জন্যে। কিন্তু তোমার সম্পর্কে আমার মনে কোন আক্রোশ ছিল না কোনদিন। এণ্ড দ্যাট ইজ ট্রু। আজ আবার সেই তোমার কাছেই ছুটে এসেছি—তাও মিমির ভালোর জন্যেই।

অর্ণব বলল—আপনি কি বলতে চাইছেন তা স্পষ্ট করে বললেই ভাল হয়। আপনার হেঁয়ালী আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

অতনু মিত্র চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে অর্ণবের হাত দুটো ধরে কাতরকণ্ঠে বললেন—তুমি ছাড়া মিমিকে আর কেউ ফিরিয়ে আনতে পারবে না অর্ণব। আমি ভুল করেছি—কিন্তু মানুষ মাত্রেই তো ভুল করতে পারে। আমি আমার ভুলের সংশোধন করে নিতে চাই। আই ওয়াণ্ট মিমি ম্যুড বি হ্যাপী। মিমির সুখ ছাড়া পৃথিবীর অন্য সব কিছু আমার কাছে এখন তুচ্ছ। তাই আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি। ইউ মাষ্ট হেল্প মি অর্ণব। তুমিও তো মিমিকে ভালোবাসো।

অর্ণব অধৈর্য হয়ে উঠছিল। বলল—অনর্থক গৌর চন্দ্রিকা না করে আসল ব্যাপারটা দয়া করে বলুন না। কি হয়েছে মিমির।

অতনু মিত্র বললেন—সেই চাঁদিপুর থেকে ফেরার পর মাত্র দু তিন দিন মিমির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তারপর তো দীর্ঘ চার মাস আমি বাইরে চলে গিয়েছিলাম। আজ চার পাঁচ দিন হল ফিরেছি। যাবার আগেই মিমিকে দেখে আমার মনে হয়েছিল—সামথিং ইজ ডিসটারভিং হার। হঠাৎ একটা দারুণ পরিবর্তন ঘটে গেছে তার মধ্যে। তখন অতটা গুরুত্ব দিইনি অবশ্য। কিন্তু ফিরে এসে শুনলাম গত চার মাসে সে একেবারে পুরোপুরি পাল্টে গেছে। সারা দিন আকণ্ঠ মদ্যপান করে। আপন মনেই কি সব বকে। কারণে অকারণে বাড়ির লোকজনকে গালমন্দ করে—জিনিষপত্র ভাঙচোর করে। মিমি জেদী একগুঁয়ে কিন্তু অশিষ্ট নয়। হঠাৎ এ পরিবর্তন তার হল কেন? এণ্ড হোয়াট ইজ মোর পেনফুল সি ইজ লিভিং

এ রেকলেশ লাইফ ফর দি লাষ্ট ফিউ মানথস। শুনে আমার মনে হয়েছে কেন জানিনা—সি ইজ আউট টু কিল হারসেলফ।

অর্ণবের বুকের ভেতরটা তোলপাড় করছিল। সুগভীর বেদনায় তার সারা শরীরটা কিরকম যেন করে উঠছিল। অর্ণব কথা বলতে পারছিল না।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে অতনু মিত্র আবার বললেন—তুমি জাননা অর্ণব এই চার মাসে কি হয়ে গেছে। মিমি একদম পাল্টে গেছে। তার ড্রিঙ্কস করাতে আমি ততটা শঙ্কিত হতাম না। বাট ইউ ইউল বি সারপ্রাইজড টু লিসন দ্যাট সি ইজ স্পেনডিং নাইটস উইথ এ্যানি টম ডিক এণ্ড হ্যারি। দ্যাট ইজ ভেরী আনইউজাল অফ হার। সি ইজ আউট অফ হার মাইণ্ড। আমি জানিনা মিমি কেন এ পাগলামি করে চলেছে।

অতনু মিত্রের দুগাল বেয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরে ঝরে পড়ছিল। প্রবল প্রতাপান্বিত মিঃ এ, কে, মিটার দুহাতে মুখ ঢেকে শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ বাদে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—আমার সব গর্ব, সব আভিজাত্য আর অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে একজন পিতা হিসেবে তোমার কাছে এসে ভিক্ষে চাইছি। ইউ মাস্ট সেভ মাই পুয়োর ডটার। তুমি ছাড়া তাকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না।

অর্ণব কথা বলতে পারছিল না। কোনমতে নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলল—আপনি বাড়ি যান। আমি দেখছি কি করতে পারি।

অতনু মিত্র চলে গেলেন

(৯)

মিমি চার পাঁচ দিন বাড়ি ফেরেনি। অনেক চেষ্টা করে শেষে অতনু মিত্র মারফৎ অর্ণব খবর পেল যে মিমি গ্র্যাণ্ড হোটেলে একটা স্যুট ভাড়া করে কোন এক হোটেল গায়কের সঙ্গে নাকি ওখানেই রয়েছে। খবরটা কতদূর সত্যি অর্ণব বুঝতে পারছিল না। কিন্তু তাহলেও মিমি যে এভাবে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে চলেছে এটা ভেবে অর্ণব খুব দুঃখ পেল। সে নিজেকে

ক্ষমা করতে পারছিল না। মিমির আজকের এ অবস্থার জন্যে সে যে অনেকটা দায়ী এ অপরাধবোধটা তাকে কেবলই পীড়া দিচ্ছিল।

অর্ণব হোটেলে এসে রিসেপশন থেকে মিমির রুম নাম্বারটা নিয়ে ফোন করল। মিমিই ফোন ধরল। অর্ণব বলল—মিমি, ইফ ইউ পারমিট—আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

মিমি খিলখিল করে হেসে উঠল অর্ণবের কথা শুনে। বলল—তুমি এত ফরম্যাল কবে থেকে হয়ে উঠলে। আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অনুমতি চাইছো।

মিমি এখানে অন্যের সঙ্গে রয়েছে খবরটা শুনেই অর্ণব একথা বলেছিলো। অন্ততঃ হঠাৎ গিয়ে পড়লে মিমি যাতে অপ্রস্তুত না হয়ে পড়ে। কিন্তু পাছে মিমি আবার চটে যায় তাই বলল—আসলে তুমি তো টায়ার্ড থাকতে পারো। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

মিমি একটু ব্যঙ্গের স্বরে বলল—টায়ার্ড থাকি আর নাই থাকি—আমার দুঃখ রাতের রাজা অনেক সঙ্কোচের পাহাড় পেরিয়ে আমার ঘরের প্রবেশ দ্বারে এসে ঘণ্টা বাজাচ্ছে—তাকে অভ্যর্থনা জানাব না তা কখনও হতে পারে। তুমি সোজা চলে এস।

মিমি একটা স্বচ্ছ নাইটি পরে ছিল। চোখের কোণে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি—মুখ জুড়ে একটা উদাস বিষণ্নতা। অন্ততঃ অর্ণবের তাই মনে হল।

মিমি বলল—তুমি একটু বোস আমি চট করে স্নানটা সেরে আসি।

অর্ণব বসে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখছিল। ডাবল সিটেড রুম ঠিকই। কিন্তু অপর কারুর অবস্থিতির কোন চিহ্ন অর্ণব ঘরে খুঁজে পেল না। কিছু না থাক বাড়তি এক জোড়া ইনডোর স্লিপার তো থাকা উচিত ছিল। ভাবলো তবে কি অতনু মিত্র ভুল খবর পেয়েছেন।

স্নান সেরে মিমি ঘরে এল। অর্ণব চুপ করে মিমিকে দেখছিল। মনে মনে মিলিয়ে নিচ্ছিল মিমি কতটা পাল্টেছে। এখানে তার থাকার খবর কোথা থেকে পেল তা মিমি তাকে জিজ্ঞেস করেনি। অর্ণব তৃপ্তি পেল মনে। অন্ততঃ একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হল না প্রথম থেকেই।

ব্রেকফাস্ট এসে গিয়েছিলো। মিমি কাপে চা ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করল—হঠাৎ তুমি এখানে হানা দিলে কি উদ্দেশ্যে?

অর্ণব স্থির দৃষ্টি মেলে মিমির দিকে চাইলো। বলল—মানুষ যদি ভুল করে তার কি সংশোধন করা যায় না। আমি ভুল একটা ধারণায় অন্ধ হয়ে তোমার প্রতি অবিচার করেছি। কিন্তু আমার প্রতি অভিমান করে এভাবে তুমি নিজেকে শেষ করে দিতে চাইছো কেন!

মিমি উচ্চস্বরে হেসে উঠলো। তার হাসি আর থামতেই চায় না। কিছুক্ষণ বাদে হাসি থামিয়ে মিমি বলল—তুমি নিজে যে একজন কমিক্যাল ক্যারেকটার একথাটা বোধহয় নিজেই জাননা। তোমাকে আমি একজন বিচক্ষণ পুরুষ মানুষ হিসেবে ভেবে ভুল করেছিলাম। এখন বুঝতে পারছি যে অতনু মিত্র লোক চিনতে ভুল করে না। সত্যিকারের পুরুষ মানুষ কখনও সেন্টিমেণ্টাল ফুল হয় না।

অর্ণব তবু চটলো না। বলল—আমি যাই হইনা কেন—কিন্তু একটা কথা তো তুমি বলবে যে এভাবে তুমি দিন কাটাচ্ছো কেন? যে জীবন তুমি গত ক'মাসে বেছে নিয়েছো তা থেকে কি তুমি শান্তি খুঁজে পাবে!

মিমি চটে গেল। বলল—হু দি হেল ইউ আর টু গিভ মি সারমন। আর এতদিন বাদে যদি এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো তবে বলব দরজা খোলাই আছে। ইউ গেট হেল আউট অফ হিয়ার।

অর্ণব বলল—কিন্তু আমি যে তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি মিমি।

মিমি বলল—কোথায়! অতনু মিত্রের সুরম্য প্রাসাদের খাঁচার বন্ধনে, না কি তোমার তিন ঘরের ছোট্ট ফ্ল্যাটের সংসারে। আমি আজ মুক্ত। জীবনের সব বন্ধন কাটিয়ে আমি পথে বেরিয়ে এসেছি টু লিভ ইন ম্যাই ওন ওয়ে।

অর্ণব বলল—কিন্তু এটাই কি জীবনের আসল পথ মিমি। তুমি যে একদিন একজন মেয়ের মত বাঁচতে চেয়েছিলে। একটা সুখী সুন্দর জীবনের যে স্বপ্ন তোমার চোখে একদিন জীবন্ত হয়ে উঠতে চেয়েছিল তাকে তুমি গলা টিপে মেরে ফেলতে চাইছো কেন মিমি।

মিমি হাসল। বড় করুণ সে হাসি। বলল—স্বপ্ন স্বপ্নই। ও কোনদিন সত্যি হয় না। তারপর অর্ণবের দিকে চেয়ে বলল, তুমি কি জান অর্ণব অতনু মিত্র আমার পিতা নয়। আই এ্যাম এ বাসটার্ড গার্ল। আর আমার মা এখনও বেঁচে—বদ্ধ উন্মাদ হয়ে রাঁচির এ্যাসাইলামে দিন কাটাচ্ছে।

খবরটা শুনে অর্ণব স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ বাদে নিজেকে একটু সংযত করে নিয়ে বলল—এ খবর তোমাকে কে দিল? এ তোমার মনগড়া দুঃখ বিলাস—এ সত্যি নয় নিশ্চয়।

মিমি বলল — ট্রুথ ইজ সামটাইম স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশান। বাবার ডায়েরী চুরি করে পড়ে আমি সব জানতে পেরেছি। উনিও শেষে স্বীকার করেছেন সব। আই এ্যাম গ্রেটফুল টু অতনু মিত্র—কিন্তু যে আমার বাবা নয় তার সঙ্গে একটা মিথ্যে সম্পর্কের বন্ধনে নিজেকে জড়িয়ে রেখে লাভ কি?

মিমি একটা সন্দেহ তার মায়ের সম্পর্কে বরাবরই করে এসেছে। কিন্তু ঘটনা যে শেষে এই দাঁড়াবে তা অর্ণব বুঝতে পারেনি। তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। কি বলে মিমিকে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পাচ্ছিল না। অতনু মিত্রের চরিত্রের একটা মহৎ দিক সে আজ নতুন করে আবিষ্কার করলো। মানুষ কেমন সহজেই অন্যকে চিনতে ভুল করে। অর্ণব কর্তব্য স্থির করে ফেলেছিল ততক্ষণ মনে মনে। তাই বলল—সে যাই হোক—তুমি তুমিই। তোমাকে আজ আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাবো নিজের কাছে। দ্বিতীয়বার আর আমি ভুল করতে রাজী নই। আই ওয়াণ্ট টু ম্যারি ইউ। ইউ উড বি মাই বিলাভেড ওয়াইফ। আমরা আবার সুখী হব মিমি। তোমাকে এভাবে আমি ফুরিয়ে যেতে দোব না।

মিমি জ্বলে উঠল। বলল—কী ভেবেছো আমায়? আমি কি বাজারের পণ্য বস্তু যে যখন খুশী আমায় কিনতে চাইবে আবার যখন খুশী ফেলে দিয়ে চলে যাবে। মন নিয়ে এভাবে কেনাবেচা চলে না।

অর্ণব বলল—আমার ভুলের জন্যে তুমি যে শাস্তি দেবে আমি তা মাথা পেতে নোব। কিন্তু আমি তোমাকে চাই মিমি। আই ওয়াণ্ট ইউ।

মিমি খুব নরম স্বরে বলল—কিন্তু আমি যে আর তোমাকে চাই না। এখানে যখন এসেছো তখন তো জেনেই এসেছো আই এ্যাম নট স্যাটিশফায়েড উইথ এ সিঙ্গল ম্যান। রোজ আমার নতুন নতুন পুরুষ চাই। এনি ড্যাম গাই—বাট হি মাষ্ট বি এ ম্যান—নট এ কাওয়ার্ড এণ্ড ইমপোর্টেন্ট ম্যান লাইক ইউ। আমার অন্তর আজ জলে পুড়ে খাঁক হয়ে যাচ্ছে। স্নেহ মায়া মমতা সব শেষ হয়ে গেছে আমার কাছে। আমার মাঝে জেগে উঠেছে অন্য আর এক নারী—এ বাসটার্ড গার্ল। সমাজে যার কোন পরিচয় নেই। মাই মাদার ওয়াজ রেপড বাই এ ডিবচ এণ্ড আই ওয়াজ বর্ন। আমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দোব সব। আমি প্রতিশোধ নিতে চাই। আই ওয়াণ্ট রিভেঞ্জ।

উত্তেজনায় আর বেদনায় মিমি বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।

অর্ণব এগিয়ে এসে পরম স্নেহে মিমির মাথায় হাত রাখল।

মিমি ফুঁসে উঠল। বলল—ডোণ্ট টাচ মি। তোমার স্পর্শে আমার শরীরে জ্বালা ধরে যাচ্ছে।

অর্ণবের চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছিল। খুব শান্ত স্বরে মনের সমস্ত আবেগ দিয়ে বলল—মিমি খোলা আকাশের দিকে একবার চেয়ে দেখ পৃথিবীটা কত সুন্দর। সুন্দর পৃথিবীতে একদিন যে শিশুটি জন্ম নিয়েছিলো সে কত পবিত্র—কত সুন্দর। তোমার জন্মের ব্যাপারে একটা দুর্ঘটনা থাকতে পারে কিন্তু তাতে কোন কালিমা তো তোমায় স্পর্শ করতে পারেনি মিমি। অতনু মিত্রকে দেখ। পরম স্নেহে তিনি তো তোমাকে নিজের কন্যার আসনে বসিয়েছেন।

মিমি তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

অর্ণব নীচু হয়ে মিমির গণ্ডে চুম্বন করলো। বলল—মিমি আমরা কি আবার সেই পুরোনো দিনগুলোতে ফিরে যেতে পারি না। তোমার চোখের সেই মিষ্টি সুখের স্বপ্নটা যে আমি জীবন্ত করে তুলতে চাই মিমি।

মিমি ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল—পারবে ভুলতে তোমার সেই সীমাকে। যে তোমার মনের সর্বস্ব নিয়ে বিজয়িনীর মত চলে গেছে। আমাকে তুমি কী দিতে পারবে? তোমার দেহ নিয়ে আমি আর কি করব। তোমার মন তো আমি পাব না। তোমার করুণা নিয়ে ভিখিরীর মত বাঁচতে চাই না আমি।

অর্ণব বলব—পারবো মিমি। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব। তুমি কি দেখতে পারছো না যে আমি আমার মিথ্যে অতীতটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তোমার পাশে এসে আজ দাঁড়িয়েছি।

মিমি উত্তেজিতভাবে জবাব দিল—ইউ ডারর্টি লায়ার। মিথ্যে কথা বলতে তোমার মুখে আটকাল না। আমি জানি তুমি তাকে ভুলতে পারবে না। ইউ আর লায়িং। তুমি আমাকে চেনো না। তোমার মত একটা ভণ্ড প্রতারক কাপুরুষকে আমি ঘৃণা করি। আই হেট ইউ।

রাগে থর থর করে মিমির সারা শরীরটা কাঁপছিল। পাগলের মত চীৎকার করতে করতে মিমি বলল, আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না। আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট টু সি ইউর আগলি ফেস এনি মোর। তুমি বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে। আই ওয়াণ্ট টু স্লিপ নাউ। আমার বিশ্রাম দরকার।

অর্ণব অপরাধীর মত আস্তে আস্তে মিমির ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মিমিকে চেনে বলেই অর্ণব জানে এখন মিমিকে বুঝিয়ে কোন ফল হবে না।

(১০)

কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে অর্ণব দেখল তার টেবিলে রঘু একটা খাম রেখে দিয়েছে। আজকের দুপুরের ডাকে এসেছে চিঠিটা। খামের ওপর হাতের লেখা দেখে অর্ণব বুঝল মিমির চিঠি। সেদিনের পর মিমি হোটেল ছেড়ে যে কোথায় চলে গেছে তার কোন হদিস পাওয়া যায়নি। অর্ণব অতনু মিত্রের সহযোগিতায় কলকাতার সমস্ত হোটেল এবং সম্ভাব্য সকল জায়গায় তন্ন তন্ন করে খুঁজেও মিমির সন্ধান পায়নি। বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজসহ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ এবং প্রাইভেট ডিটেকটিভ লাগিয়েও মিমির খোঁজ মেলেনি।

অর্ণব উৎকণ্ঠা এবং আগ্রহ সহকারে খামটা খুলে ফেলল। মিমি এখন কোথায় আছে তার হয়ত একটা সন্ধান এতে পাওয়া যাবে। মিমি লিখেছে—

'কোনদিন ঈশ্বর মানিনি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে ঈশ্বর বোধহয় আমার সঙ্গে প্রচণ্ড একটা রসিকতা করার জন্যে পৃথিবীতে আমায় পাঠিয়েছিলেন। আমার মনের ভেতর একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে গেছে কয়েক মাসে।

বিস্ফোরণের সেই আঘাতকে প্রত্যাঘাত করার জন্যে আমি প্রতিশোধ নিয়ে তৃপ্তি পেতে চাইলাম। কিন্তু কার প্রতি আমি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছি! জীবন থেকে যতই আমি হেরে যেতে লাগলাম ততই মনের অবচেতনে হয়ত নিজের বিরুদ্ধেই প্রতিশোধ নেবার একটা অদম্য স্পৃহা আমার জেগে উঠল। নয়ত আমি এ রকম করলাম কি করে!

তোমাকে যে আমি কতখানি ভালবেসেছিলাম—পুরুষ হয়ে তা তুমি বুঝতে পারলে না কেন জানিনা। সীমা তোমাকে কি দিতে পারবে। তার কাছে তুমি আর কি পাবে! তুমি মূর্খ তাই বুঝতে চাইছো না যে সীমা নিজের সংসারের যে বিবরে প্রবেশ করে আছে তা থেকে আর কোনদিন সে বাইরে বেরিয়ে আসবে না।

আমার চেতনার আলোকে দিনে দিনে একটা জিনিষ সত্য হয়ে উঠছিল। আমার শুধু মনে হচ্ছিল তুমি ছাড়া আমার পূর্ণতা নেই। তুমি আমার প্রাণের নিঃশ্বাস—তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না।

আমার বাপি (জন্মদাতা না হলেও তিনি তো আমায় কন্যার মর্যাদা দিয়েছেন) একটা নিষ্ফল বেদনায় সারা জীবন আমার মতই জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করে এসেছেন। জীবনে এত পেয়েও তিনি কিছুই পেলেন না। এক এক সময় আমার মনে হয়েছে বাপি যদি প্রথম থেকে এভাবে সব কিছু গোপন না করে আমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতেন তবে হয়ত আমরা সত্যিকারের পিতা-কন্যা হয়ে উঠতে পারতাম।

বাপীর ডায়েরি পড়বার পর তোমার কাছ থেকে পাওয়া আঘাতটা আমায় বেশী করে আমায় পীড়া দিতে লাগলো। মনে হল তুমি বোধহয় সব

জান। আমার জন্মের দোষে তবে কি তুমি আমায় গ্রহণ করতে চাইছ না। আমার জন্মের জন্যে আমার কি দোষ বল!

আমি ক্ষিপ্ত হয়ে গেলাম। তার পরের ঘটনা তো তুমি জানোই।

আচ্ছা অর্ণবদা—সারা জগতের নাম করে আমি কি তোমার প্রতি প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেছি। আমি কি আসলে তোমাকে আঘাত দেবার জন্যে দিনের পর দিন এভাবে নির্লজ্জতা করেছি, আমার সংস্কার—বিচার বুদ্ধিকে ঢেকে রেখে। আমি মৌসুমী মিত্র (ইংরাজীর এম্-এ) মালটি মিলিওনিয়ার মিঃ এ, কে, মিটারের একমাত্র কন্যা (নাকি পালিত কন্যা)—সোসাইটির বহুজনের কামনার বস্তু—সেই আমি—ভাবতে পারো অর্ণবদা, দিনের পর দিন একটা কল গার্লের মত অচেনা পুরুষ নিয়ে মাতামাতি করেছি। লোকে বিশ্বাস করবে না জানি—কিন্তু তুমি তো করবে অর্ণবদা—এর পেছনে আমার কোন সেক্স হাঙ্গার ছিল না। আমার বিচার বুদ্ধি লোপ পেয়ে গিয়েছিল—প্রতিশোধ নেবার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম আমি। কিন্তু কার প্রতি কিভাবে প্রতিশোধ নোব আমি। এভাবে যে তোমার প্রতি—নিজের প্রতি প্রতিশোধ নেওয়া যায় না তা যখন বুঝলাম তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। কেউ বিশ্বাস করবে না একথা। আঙ্গুল দিয়ে আমার দিকে দেখিয়ে বলবে—এ বাসটার্ড গার্ল এণ্ড এ সেক্স ম্যানিয়াক।

সেদিন তোমাকে ওভাবে তাড়িয়ে দিয়ে বড় কষ্ট হয়েছিল আমার। তোমাকে দেখে সেদিন আমার মাথায় আগুন জ্বলে গিয়েছিল। সবকিছুর জন্যে মনে হচ্ছিল তুমিই দায়ী। পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিও। ভাগ্যকে কেউ বদলাতে পারে না; আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। বাঁচবার কোন ইচ্ছেই আমার নেই।

এ চিঠি তুমি যখন পাবে তখন হয়ত আমি অন্য আর এক অচেনা জগতের নতুন আলোয় আমার এই ব্যর্থ অন্ধকারময় জীবনের হারিয়ে যাওয়া পথটাকে খুঁজে বেড়াবার চেষ্টা করছি। বাপীকে বোলো তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন। তাঁর মহত্ত্বের উপযুক্ত মর্যাদা আমি দিতে পারলাম না। তোমার সঙ্গে আমার হয়ত আর দেখা হবে না—সম্ভব হলে আমাকে ভুল বুঝো না। আর

জীবনটাকে এভাবে তুমি নষ্ট করে দিও না। সীমাকে ভুলে একটা সাদামাটা ঘরোয়া মেয়ে দেখে বিয়ে করে সুখী হবার চেষ্টা করো।

ইতি

তোমার মিমি।

পুনঃ—এ কদিন রাঁচী ছিলাম। আমার মার সঙ্গে দেখা হল। এত করে মা মা বলে ডাকলাম। মা আমাকে চিনতে পারলো না।

চিঠিটা পড়ে অর্ণব অশান্ত হয়ে উঠেছিল। মিমি কোথায় আছে তা লেখেনি। অতনু মিত্রকে দু' তিনবার ফোন করেছিল। কিন্তু রাত্রি একটা পর্যন্ত তাঁকে বাড়িতে পায়নি। অর্ণব ভেবেছিল ভোরবেলাতেই অতনু মিত্রের সঙ্গে দেখা করে একটা ব্যবস্থা করবে। অর্ণব বিছানায় শুয়ে খালি এপাশ ওপাশ করছে, ঘুমোতে পারে নি। রাত তখনও শেষ হয়নি। হঠাৎ ফোন বেজে উঠতে দৌড়ে গিয়ে অর্ণব ফোন ধরল। অতনু মিত্রের গলা। শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে অতনু মিত্র শুধু বললেন—সি ইজ ডেড। রাইট ইন মাই ল্যাপ—মাই পুয়োর চাইল্ড।

অর্ণবের হাত থেকে রিসিভারটা পড়ে গেল। সারা জগৎটা তার চোখের সামনে বনবন করে ঘুরতে লাগলো। অর্ণব মুহ্যমানের মত সামনের চেয়ারটাতে বসে পড়ল। চোখের সামনে সব কিছু তার অন্ধকার মনে হচ্ছিল।

এরকম একটা আন্দাজ করেছিল অর্ণব মিমির চিঠিটা পড়ে। মিমির চিঠিতে তার ভবিষ্যতের একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল ঠিকই—কিন্তু তা এত তাড়াতাড়ি ঘটবে তা ভাবতে পারেনি সে। অর্ণব ভেবেছিল মিমিকে সে যে করেই হোক আবার সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনবে। মিমি তাকে একবার শেষ সুযোগটুকুও দিল না। অভিমান করে নিজেকে শেষ করে দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যন্ত্রচালিতের মত অর্ণব অতনু মিত্রের বাড়ি এসে পৌঁছোল। সুশোভনবাবু অস্থিরভাবে বাইরে পায়চারী করছিলেন। অর্ণবকে দেখে শিশুর মত কেঁদে উঠলেন। বললেন—অর্ণববাবু আমি বাড়ির ম্যানেজার—কিন্তু মিমিকে যে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলাম। এভাবে মেয়েটা চলে গেল।

সুশোভনবাবুর কাছেই অর্ণব জানল যে মিমি দুপুর থেকেই ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়েছিল। তাকে ডিসটার্ব না করতে বলেছিলো। রাত্রে খেতে না আসতেও কেউ কোন সন্দেহ করেনি। এরকম তো মিমি প্রায়ই করে। অতনু মিত্র বাড়ি ফেরেন রাত্রি আড়াইটে নাগাদ। মিমি দুপুর থেকে ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে আছে এবং রাত্রেও কিছু খায়নি শুনে মিমির ঘরে গিয়ে বেল টেপেন। কোন সাড়া না পাওয়াতে দরজা ভেঙে দেখলেন মিমি বিছানায় শুয়ে আছে। মুখ চোখ নীল হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকা হল। কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে ততক্ষণ। প্রচুর ঘুমের বড়ি খেয়ে মিমি তখন ইহজগতের মায়া কাটিয়ে চলে গেছে।

অর্ণবকে জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধ সুশোভনবাবু হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

অর্ণব সুশোভনবাবুর হাত ছাড়িয়ে মিমির ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। সারা বাড়িতে একটা বিস্ময়কর নীরবতা। ঘরের ভেতর মিমির মাথাটা কোলে নিয়ে নিথর নিস্পন্দের মত অতনু মিত্র বসে আছেন পাথরের স্ট্যাচুর মত। অবিরল ধারায় তাঁর দুচোখ বেয়ে জল ঝরে ঝরে মিমির মুখটা ভিজিয়ে দিচ্ছে।

অর্ণবকে দেখে অতনু মিত্র উঠে পড়লেন। শুধু বললেন—ইউ টেক চার্জ অফ মাই পুওর চাইল্ড মাই বয়। আমি আর পারছি না।

অর্ণব ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল মিমির দিকে। অতনু মিত্র ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার আগে আর একবার ছুটে এসে মিমিকে জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—এ তুই কি করলি মা। আমি যে মোহিনীকে কথা দিয়েছিলাম তোকে অর্ণবের হাতে তুলে দেবে। লুক মাই চাইল্ড হি ইজ হিয়ার।

পাগলের মত চীৎকার করে উঠলেন অতনু মিত্র— কাণ্ট ইউ ওপেন ইউর আইজ। একটিবার চোখ মেলে তাকা মা। আমার ওপর অভিমানটাই তোর বড় হোল। আমার মনটাকে তুই চিনতে পারলি না। আমি তোর সত্যিকারের বাবা হলে পারতিস এভাবে আমাকে ছেড়ে যেতে।

অর্ণব পাথর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কর্তব্য বিস্মৃত হয়নি। অতনু মিত্রকে আস্তে আস্তে মিমির ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এসে ইজি চেয়ারের ওপর বসিয়ে দিল সযত্নে। ফিরে আসতে আসতে শুনলো অতনু মিত্র চীৎকার করে বলছেন—

ন্ন মি ইউ কিল্ড ইওর সেলফ। মোহিনী—আমি হেরে গেলাম। আই লষ্ট এভরিথিং ইন মাই লাইফ। আমার সব ফুরিয়ে গেল।

অর্ণব ভাবল কাঁদুক অতনু মিত্র। আজ তার কাঁদার দিন।

ঘরে এসে অর্ণব মিমির মুখের দিকে তাকাল। অতনু মিত্রের চোখের জলে মিমির সুন্দর মুখটা ভিজে গেছে। মিমির চোখ দুটো ঈষৎ উন্মুক্ত। মনে হচ্ছিল এক পরম প্রশান্তিতে শ্রান্ত, ক্লান্ত মিমি ঘুমিয়ে রয়েছে। এইমাত্র উঠে অর্ণবের সঙ্গে আবার কথা বলবে। পূবের আকাশ লাল করে প্রভাতের নতুন সূর্য উঠছে। সূর্যের তাজা একফালি কিরণ ঘরের খোলা একটা জানলা দিয়ে বিধাতার আশীর্বাদের মত মিমির সারা অঙ্গে এসে ঝরে পড়ছে।

পৃথিবীর সব আলো মিমির দেহে এসে পড়ুক। ভোরের বাতাস তার পরম স্নিগ্ধতার মাধুর্য নিয়ে মিমির দেহের সব জ্বালা শান্ত করে দিয়ে যাক। অর্ণব গভীর দৃষ্টি মেলে মিমির দিকে তাকাল ভাল করে। মনে হল এক গুচ্ছ তাজা রজনীগন্ধা বর্ষার জলে স্নাত হয়ে তার সব কুঁড়িগুলো মেলে দিয়ে ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে।

মনের সব ভালবাসা আর মাধুরী দিয়ে অর্ণব মিমির শিথিল অবস শীতল ওষ্ঠে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিতে লাগলে।

অর্ণব বলছিল—মৃত্যু জীবনের শেষ নয়। আমার সকল নিয়ে তোমার আগমনের আশায় প্রহর গুনেছি মিমি। তুমি এলেই যদি তবে এভাবে এলে কেন। মিমি তোমার মৃত্যুর ভেতর দিয়ে আমার স্মৃতিতে তুমি বেঁচে থাকবে চিরকাল—শাশ্বত—অব্যয়—অবিনশ্বর হয়ে। আমার চেতনায় তোমার মৃত্যু নেই।

অর্ণব একটা সাদা চাদর দিয়ে মিমির গলা পর্যন্ত ঢেকে উঠে গিয়ে ঘরের সব জানালাগুলো খুলে দিল।

আলো আসুক। ভোরের মিষ্টি তাজা উজ্জ্বল আলো। নতুন আলোর সন্ধানে যাত্রা শুরু করেছে অচেনা এক জগতের উদ্দেশ্যে মিমি। তার যাত্রা পথ স্বর্গীয় আলোর জ্যোতিতে ভরে উঠুক। কল্পনার সেই আলোর ছটায় অর্ণব দেখলো মিমির সুন্দর মিষ্টি মুখটা আলোকিত হয়ে উঠেছে।

—•)(•—